# পাঁচরঙা ইউরোপ

মডার্ন কলাম
১০/২এ, টেমার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

PANCHRANGA EUROPA

প্রথম প্রকাশ : শ্রাবণ ১৩৬২

প্রকাশিকা :
লতিকা সাহা / মডার্ন কলাম
১০/২ এ, টেমার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

মুদ্রাকর :
সোনালী দেব / অভিরুচি
৩/৪, গৌড়ীবাড়ী লেন, কলকাতা-৭০০০০৪

# ভূমিকা

অহিভূষণ মালিক শুধু যে খ্যাতনামা সমালোচক, এবং কার্টুনিস্ট তাই নন, তিনি যে একজন পাকা লেখকও, পাঠকরা তার প্রমাণ পাবেন অহিভূষণের সাম্প্রতিক ভ্রমণ কাহিনীতে। চিত্রশিল্পী যেমন রং তুলিতে ডিটেইল ফুটিয়ে একটি সুন্দর অবয়ব গড়ে তোলেন, অহিভূষণ তাঁর বর্ণনায় ভাষাকে ব্যবহার করেছেন সেই রকম রং তুলির মতই। তাঁর ফলে তিনি যখন তাঁর অভিজ্ঞতা আমাদের কাছে বর্ণনা করেন, তখন পাঠক হিসাবে আমাদের মনে হতে থাকে যে আমরাও যেন তার সঙ্গে সঙ্গেই চলেছি। ভ্রমণ কাহিনী রচয়িতার এই গুণটি আজকাল অনেক ভ্রমণ কাহিনীতেই উপেক্ষিত হয়ে থাকে। সেই দুর্লভ গুণটি অহিভূষণের এই রচনার মধ্যে যে পাওয়া গেল সেটা অবশ্যই আমাদের পক্ষে আনন্দের কথা।

পশ্চিম জার্মান সরকারের আমন্ত্রণে লেখক সে দেশে গিয়েছিলেন মিউজিয়াম চিত্র ও ভাস্কর্যের নানা নিদর্শন দেখবার জন্য। তিনি যেন সেই সঙ্গে আগ্রহী বাঙালী পাঠককেও টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন। ফ্রাংকফুর্ট বিমানক্ষেত্রে নামার আগে থেকে সত্যি বলতে কি দমদম বিমানবন্দর থেকে এরোফ্লোটে চড়ার সঙ্গে সঙ্গে অহিভূষণের ধারা বিবরণী শুরু হয়। আবার এই দেশের মাটিতে ফিরে এসে তার শেষ। সরস অনায়াস সেই প্রকাশভঙ্গী। শিল্পীর তীক্ষ্ণ নজর এমনই অভিজ্ঞ যে সামান্য ডিটেইলও ফাঁক পড়ে যাবার উপায় নেই। এরোফ্লোটের যাত্রীরা যে ভারত-মস্কো পথে এক রকম খাতির পান আবার মস্কো-ইওরোপের ফ্লাইটে তাদের খাতিরের ধরণ যে কিঞ্চিৎ বদলে যায়, এই ব্যাপরটা তার যেমন নজর এড়ায় না, তার বর্ণনাও তিনি যেমন অনায়াসে বলে গিয়েছেন তেমনি অনায়াসে মিউনিখের মিউজিয়ামে চিত্রশিল্পের অমূল্য সংগ্রহের সামনে দাঁড়িয়ে কোনটা বারোক শিল্প আর কোনটাই বা রোকোকো সেটা আমাদের চিনিয়ে দিয়েছেন। এ দুই চিত্রধারার অর্থ এবং চরিত্রগত পার্থক্যই বা কী এমন দৃষ্টান্তে বইটি ভরা। যেন পাশের সঙ্গীর সঙ্গে কথা বলতে বলতে তিনি সেটা আমাদের অত্যন্ত মনোগ্রাহী করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। অহিভূষণের এই ভ্রমণ কাহিনী পড়লে ইওরোপীয় কলা সম্পর্কে অনেক আশ্চর্য কথা জানতে পারবেন।

সহধর্মিনী অঞ্জলী-কে

# ব্রুকেদের বার্লিন

ফ্রাংকফুর্ট ! বিশালতম এয়ারপোর্টগুলির অন্যতম—মিনিটে একটি করে সারা দিন সারা রাত এরোপ্লেন নামে এবং ওঠে। শুনে খুব কৌতূহল নিয়ে চারদিকে তাকালাম। ফ্রাংকফুর্ট থেকে আমাকে যেতে হবে বার্লিন। বার্লিন মানে পশ্চিম বার্লিন। এখন আবার বার্লিন শহর দুটো হয়ে গেছে, একটা পশ্চিম আর অন্যটা পূর্ব। ১৯/২০ বছরের একটি মেয়ে 'ইন্টের নাশিওনের' প্রতিনিধি এসেছে আমাকে স্বাগতম জানাতে। বার্লিনের এরোপ্লেন ছাড়তে দেরী আছে, মেয়েটির সঙ্গে এয়ারপোর্ট চত্তরের চারপাশে চক্কর খাচ্ছি আর মাঝে মাঝে বেঞ্চিতে বসছি পাশাপাশি। প্রশ্ন করছি কি মেয়েটির নাম, কি তার কাজ, স্বামী কি করেন ইত্যাদি। না স্বামী এখনও হয়নি, এখনও ইউনিভারসিটির ছাত্রী তালিকায় নাম, অভিভাবক বাবা-মা। ভারি মিষ্টি মেয়ে। দারুণ কৌতূহল তার ভারতবর্ষ সম্বন্ধে। কথায়

কথায় সময় কেটে গেল। বার্লিনের টিকিট আগে থেকেই কেনা ছিল, আমার হাতে সেটি ধরিয়ে দিয়ে, সময় আসতে, মেয়েটি বিদায় নিল। এরোপ্লেনে পাশে বসলেন এক শ্বেতাঙ্গ ভদ্রমহিলা, কোলে তাঁর বছর দুয়েকের শিশু। শিশুটি একেবারে কাকের মত কালো, ঠোঁট দুটো পুলিপিঠের মত মোটা। ঐ মোটা ঠোঁট দিয়ে চেপে ধরে রেখেছে একটা লাল টকটকে চুষিকাঠি। কি ছটফটে, মায়ের কোল থেকে ছিটকে ছিটকে লাফিয়ে আসছে আমার দিকে। আমি বসেছি জানলার পাশে, ক্ষুদে কানাইয়ার তা সহ্য হচ্ছে না! ঠিক পিছনের আসনে বসেছেন দৈত্যাকৃতি দুই আফ্রিকাবাসী, বুঝলাম ওঁদেরই মধ্যে একজন ঐ শ্বেতাঙ্গ মহিলার কর্তা। আশ্চর্য! মায়ের সঙ্গে শিশুটির মুখাবয়বে আর গায়ের রঙে তিলমাত্রও নেই মিল। আমাদের দেশে, দেখেছি, কেউ মেম বিয়ে করলে ছেলে মেয়েদের চেহারায় গর্ভধারিনীর ভাবটাই থাকে শতকরা পঁচাত্তর ভাগ। কিন্তু কাফ্রির বেলায় অমন হল কেন? কারণটা জন্ম-বিজ্ঞানীরা বলতে পারবেন?

হাওয়াই জাহাজ গুটিগুটি এগিয়ে একটি জায়গায় পৌঁছে চুপটি করে দাঁড়াল। সামনে দিয়ে, দেখছি, একটার পর একটা প্লেন জমি ছেড়ে শূন্যে উঠে চলেছে, বিরাম নেই। আমাদের যানটির পালা আসতে সেও নড়ে চড়ে উঠল, এবং মন্থর গতি, এগিয়ে গিয়ে নিজ মুখটি ফিরিয়ে নিল সামনের লম্বা কংক্রীটের রাস্তার দিকে। তারপর সংকেত পাওয়া মাত্রই দৌড়। ভূমি ছাড়ার পর ঘন্টা খানেকের মধ্যেই বার্লিন!

তখনও বেশ বেলা রয়েছে, কটকটে রোদ। ইউরোপ বলতে যে ধারণা নিয়ে দেশ থেকে রওনা হয়েছিলাম তা ভেঙে গেছে। কোথায় সেই শীত আর কুয়াশা, যা শুনে এসেছি? বাড়িগুলি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, যেন রঙীন পেন্সিলের ড্রইং। ভেবেছিলেম বার্লিনেও ফ্রাংকফুর্টের মত, কোনও মহিলা আসবেন অভ্যর্থনা

জানাতে, কিন্তু লাগেজ বেল্ট থেকে মাল তুলে নিয়ে ঘেরা এলাকার বাইরে বেরুতেই সোনালী চুলের আর মাঝামাঝি উচ্চতার এক বছর চল্লিশ বয়সের ভদ্রলোক বললেন, "মিস্টার মা্লিক ?" এঁরই সঙ্গে ঘুরতে হবে যে ক'দিন বার্লিনে থাকব। নাম নিউহাউস। শ্রী নিউহাউস আমাকে ট্যাক্সিতে চাপিয়ে চললেন হোটেলের দিকে, ইউরোপা সেন্টার হোটেল। ট্যাক্সির সামনের কাচের মধ্যে দিয়ে দেখা যাচ্ছে একটা চার্চের মত লম্বা বাড়ি, মাথাটা ভেঙ্গে গেছে, গায় জায়গায় জায়গায় কালো পোড়া দাগ। আঙুল উঁচিয়ে নিউহাউস বললেন, "ঐ যে দেখছেন ভাঙা চার্চ, ওটি গত বিশ্বযুদ্ধে বোমার ঘা খেয়েও ধরাশায়ী হয়নি। ওটি আমরা রেখে দিয়েছি যুদ্ধের স্মারক হিসেবে। এই বার্লিনের বুকে কি তাণ্ডব লীলাই না হয়েছে। ওটা ভয় দেখানও বটে! আবার যদি যুদ্ধ করেছ তো ঐ অবস্থার পুনরাবৃত্তি অবশ্যম্ভাবী—।"

গাড়ি চার্চের কাছাকাছি এসে গেছে, কলকাতা শহরের মতই ট্রাফিক জাম! পুলিশ ব্যস্ত হয়ে সব গাড়ি অন্য রাস্তায় ঘুরিয়ে দিচ্ছে। ট্যাক্সি ড্রাইভার আর নিউহাউসের মধ্যে, জার্মান ভাষায় কথাবার্তা চলছিল, আমার তা একবর্ণও বোধগম্য নয়, নিউহাউস জানালেন, সামনে ডেমন্সট্রেশন হচ্ছে, তাই আমাদের ঘুরে যেতে হবে অন্য পথ ধরে, মিনিট ১৫ আরও বেশী সময় লেগে যাবে হোটেলে পৌঁছতে, উপায় নেই! আমার কাছে ১৫ মিনিট বেশী লাগা না লাগা সবই সমান, বললাম, "কিন্তু হওয়ার কিছু নেই, ডেমন্সট্রেশনটা কিসের ?'

"আমাদের ওয়েস্ট বার্লিনে প্রত্যেক দু দিন অন্তরই দেখা যায় ডেমন্সট্রেশন হচ্ছে।"

"ঘাবড়াবার কোনও কারণ নেই, আমি কলকাতার মানুষ। কলকাতা শহরে প্রত্যেক দিনই ডেমনসট্রেশন হয়ে থাকে। আসল কথাটা—ডেমনসট্রেশনটা কিসের ?" ড্রাইভারের কাছ থেকে শুনলাম

কতিপয় কাশ্মিরী অনশন করছে। তাদের দাবী—ভারত, কাশ্মীর ছাড়ো! বার্লিন শহরে এ অনশনের কি অর্থ থাকতে পারে বুঝলাম না! হোটেলে পৌঁছে সঙ্গীকে বললাম, "খুব ক্লান্ত, প্রায় ২৪ ঘণ্টা এরোপ্লেনে উড়ে এসেছি, আজ আর নয়, কাল সকাল থেকে যেখানে নিয়ে যাবেন, যাব আপনার সঙ্গে।"

সন্ধ্যা আটটা। আশ্চর্য! জানালা দিয়ে ঘরের মধ্যে একতাল রৌদ্র বুঝিয়ে দিচ্ছে সূর্যদেব তখনও পশ্চিম দিগন্তে জ্বলজ্বল করে জ্বলছেন। ঘরের মধ্যেই মিনি বার, পানীয় আর স্ন্যাকস ঠাসা। রাত্রে ডিনারের দরকার নেই, ঐ স্ন্যাকস খেয়ে দিব্যি পেট ভরে যাবে। বাথটবে গরম জল ঠাণ্ডা জল মিশিয়ে স্নান সারলাম, তারপর লুঙ্গী আর গেঞ্জি পরে বসে রইলাম খানিক্ষণ জানলার বাইরে রাস্তার দিকে তাকিয়ে। জানলার স্বচ্ছ কাচের পাল্লা খোলার কোনও উপায় নেই। দিনের আলো ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে এল, চতুর্দিকের রাশি রাশি বিজলী বাতি চকমকিয়ে উঠতে লেগেছে। চিঠি লিখতে বসলাম, প্রথম চিঠিটি আমার গৃহিনীর উদ্দেশ্যে। কিন্তু সে চিঠি আমি ভারতে ফিরে আসার প্রায় আরও মাস খানেক পর নির্দিষ্ট ঠিকানায় পৌঁছেছিল!

পরের দিন বেলা ন'টায় নিউহাউসের আসার কথা আমার আস্তানা পালাস হোটেলে। রেডী হয়ে বেরিয়ে পড়লাম ঘরের বাইরে। সর্বনাশ! ঘরের চাবি যে কিছুতেই লাগে না। হোটেল মেইড ছোট্টখাট্ট গোলগাল চেহারার মহিলা একটা ঠেলাগাড়ি করে বিছানার চাদর তোয়ালে ইত্যাদি নিয়ে এগিয়ে আসছিল, বললাম, "দরজা যে বন্ধ হয় না।" মেইড কিছুই বুঝল না, বুঝবে কি করে, সে তো ইংরাজী জানে না! ইঙ্গিতে বোঝালাম চাবি লাগে না। মুচকি হেসে এগিয়ে এসে অতি সহজে চাবিটি ঘুরিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল সে। আমি কি আনাড়ি! ধন্যবাদ জানালাম, কিন্তু তাও মেইড বুঝতে পারল বলে মনে হল না।

নিচে নেমে দেখি নিউহাউস এক পায়ের ওপর আরেক পা পেঁচিয়ে দিয়ে খবরের কাগজ পড়ছেন আরামে নরম শোফায় উপবিষ্ট হয়ে। বললাম, "আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন, ব্রেকফাস্টটা সেরে আসি গ্রীল থেকে।" ব্রেকফাস্টের ব্যবস্থা ঐ হোটেলেই, ডিনার-লাঞ্চ যত্রতত্র। জার্মানীর সব হোটেলে এইটেই রীতি। হোটেলের সঙ্গেও রেস্তোরাঁ থাকে, সেখানে খাওয়া চলতে পারে, কিন্তু দাম নগদা দিতে হবে, ঘর ভাড়ার সঙ্গে তা জোড়া পড়বে না। ব্রেকফাস্ট খরচ ঘর ভাড়ার মধ্যে ধরে নেওয়া হয়। পশ্চিম দিক সবটা কাচে ঢাকা সারা গ্রীলে রোদ্দুরের বন্যা, একটা জুতসই টেবল দখল করে বললাম, "সিদ্ধ ডিম পাওয়া যাবে?" আবার সেই সমস্যা, বয়েল্ড এগ বলতে কি বোঝায় বয় তা জানে না। একটি মেয়ে ওয়েটার ঐ বয়ের কানে কানে কিছু বলে দিল, মিনিট তুয়েকের মধ্যে আমার সামনে সিদ্ধ ডিম হাজির। ব্রেড, বাটার, চীজ, জ্যাম, জেলি, হ্যাম, তুধ, ক্ষীর নানান রকম প্যাকেটে ঝুরি ভরতি ভরতি টেবিলে জমা, যা খুশি যত খুশি উদরস্থ করা যেতে পারে। হঠাৎ নিউহাউস গ্রীলে এসে আমার সামনের চেয়ারটি দখল করলেন, জার্মান ভাষা না জানায় আমাকে নিশ্চয় অসুবিধায় পড়তে হচ্ছে, বললাম, "ম্যানেজ করে নিচ্ছি!" পেট ভরে খেয়ে নিলাম, কটার সময় লাঞ্চ খেতে পাব তা তো জানা নেই! ঘোরাঘুরি, খাওয়া-থাকার কিছু খরচ লাগছে না, সব ইস্টের নাশিওনের দায়িত্ব। প্রথম শ্রেণীর হোটেল প্রথম শ্রেণীর আতিথেয়তা।

গিয়েছিলাম জার্মানীতে ফেডেরাল রিপাবলিক অব জার্মানীর আমন্ত্রণে জার্মানীর বিভিন্ন শহরের আরট মিউজিয়াম, আরট গ্যালারী ইত্যাদি দেখতে। কথা ছিল রটারডামের বিশ্ব আরট কংগ্রেস সেরে জার্মানী আসব। কিন্তু নানা কারণে রটারডাম যাওয়া হয়নি। কারণগুলো না উল্লেখ করাই মঙ্গল। জার্মানী দেখার আমন্ত্রণটা কোনও মতে হাতছাড়া হয়ে যেতে দেওয়া যেতে পারে না। রুশ

এয়ার ওয়েজ এরোফ্লোটের টিকিট হাতে নিয়ে জার্মানী পৌঁছেছিলাম। মস্কো হয়ে জার্মানী। এরোফ্লোটের টিকিট কাটার দুটি কারণ, প্রথমটি হল অন্য এয়ারওয়েজ অপেক্ষা এরোফ্লোটের ভাড়া অবিশ্বাস্য রকম কম। দ্বিতীয় কারণ এরোফ্লোটের প্লেন আমাদের দমদম এয়ারপোর্ট থেকেই ছাড়ে, দিল্লী কিংবা বোম্বাই পৌঁছে ইউরোপগামী উড়োজাহাজ ধরার প্রয়োজন হয় না। বছর তিনেক আগে অস্ট্রেলিয়ার এডেলেড শহরে বিশ্ব আর্ট কংগ্রেস বসেছিল। সেবার কোনও অন্তরায়ের সৃষ্টি হয়নি, ঐ কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলাম। বোম্বাই থেকে এয়ার ইণ্ডিয়ার জাম্বো জেট উড়ে টানা নিয়ে গিয়ে পৌঁছে দিয়েছিল সিডনীতে; মধ্যে সিঙ্গাপুরে একবার আর পার্থ-এ একবার প্লেন মাটি ছুঁয়েছিল বটে কিন্তু যাত্রীদের নামতে হয় নি। এরোফ্লোটের ইলুসীন উড়োজাহাজ জাম্বো জেটের থেকে আয়তনে অনেক ছোট; এক্সপার্টের মত কথা বলা আমার বাড়াবাড়ি হবে, তা হলেও মনে হয়, ছোট প্লেন এক দমে বেশী লম্বা পাড়ি দিতে পারবে না বলেই মস্কোয় বদল করার নিয়ম। মস্কোর আগে তাসকন্দ বা তাসখেণ্টে নামতে হয়েছিল ঘণ্টা দেড়েকের জন্মে। এয়ার হসটেস সামনে এসে ঘোষণা করল, "ইট ইজ টু বি ক্লিনিং, এভরিবডি মাস্ট বি ওয়াকিং।" বাধ্য হয়ে ওয়াকিং করতে হয়, প্লেন থেকে বেরিয়ে যেতে হয় সবাইকে। রাত তখন তিনটে পেরিয়ে গেছে, বেশ ঠাণ্ডা! এয়ারপোর্টের আহারাগারে লম্বা টেবিলে ইয়া বড় বড় দুটি জগ হাতে ধরে বিরাটকায়া এক উজবেকী রমণী মিঠাপানি রেখে গেলেন, মুখে তাঁর কোনও শব্দ নেই। তাসকন্দ এয়ারপোর্টের টয়লেট ভারতীয় কোনও সিনেমা হাউসের প্রস্রাবাগারের মতই প্রায়। এই-টুকুই আমার অভিজ্ঞতা হয়েছে উজবেকিস্তানের রাজধানী সম্বন্ধে। মস্কোয় যখন পৌঁছলাম, একেবারে সকাল। সে এক পর্ব বটে! টিকিট চেয়ে নেওয়া হল, পাশপোর্টের সঙ্গে চেহারা মিলিয়ে দেখে নেওয়া হল, সারা অঙ্গ পরীক্ষা করা হল। টিকিট আর পাশপোর্ট

ফেরত পাওয়া মাত্র লাগালাম দৌড়, কিন্তু কোন দিকে যাব? যেদিকে এগোই সামনে স্বচ্ছ কাচের পার্টিশনের বাধা। বাধা পেতে পেতেই শেষ পর্যন্ত পথ পেলাম, পার্টিশনের ওপারে গিয়ে আবার সিকিউরিটি চেকিং, মহিলা অফিসাররা পুরুষদের থেকেও কড়া, শুধু ইণ্ডিকেটর দিয়ে পরীক্ষা করেই তাঁরা সন্তুষ্ট হতে পারছেন না, টিপে টিপে সারা অঙ্গ বারবার দেখে নিঃসন্দেহ হলে তবে ছাড়ান দেবেন। অবশেষে ফ্রাঙ্কফুর্টগামী প্লেনে চেপে বসলাম। আবার সেই ইলুশীন প্লেন। ভারত হতে যে প্লেনে মস্কো পৌঁছেছিলাম তার থেকে এ প্লেনটি অনেক পরিষ্কার আর আতিথেয়তাও অনেক বেশী কেতা-দুরস্ত। আকাশে ওড়ার সঙ্গে সঙ্গেই সামনে লাঞ্চ। ভারতীয়দের কাছে অবশ্যই সে লাঞ্চ লোভনীয় নয়, কিন্তু গতি কি? কতক্ষণে ফ্রাংকফুর্ট পৌঁছেছিলাম বলতে পারি না, আমার হাতের ঘড়ির সঙ্গে কোনও সময়েরই মিল হচ্ছে না, কলকাতায় ঘড়ি মিলিয়ে বেরিয়েছি, তাসকন্দে এক সময়, মস্কোয় আরেক সময়, আবার ফ্রাংকফুর্টে পৌঁছে সব গোলমাল হয়ে গেল। ফ্রাংকফুর্টের ঘড়িতে তখন সোয়া তিনটে।

"আরট মিউজিয়াম, গ্যালারী, অ্যাকাডেমী ইত্যাদি দেখার আগে যদি আপনাকে বার্লিন শহরটা খানিকটা ঘুরিয়ে দেখাই আপত্তি নেই তো?"

"শহরটা তো দেখতেই হবে নয়তো বুঝব কি করে কোথাকার আরট সংগ্রহ দেখতে এসেছি!"

"ঠিক কথা, চলুন একটা ট্যাক্সি ধরা যাক।" হোটেলের ফটক পেরিয়ে সামনে ট্যাক্সি। বছর বিশ কি বাইশের এক তন্বী ড্রাইভার। গলার স্বর নামিয়ে দিয়ে নিউহাউসকে প্রশ্ন করলাম, "এখানে মেয়েরাও ট্যাক্সি চালায়?"

"হ্যাঁ! ইউনিভারসিটির ছাত্রী। পড়ার খরচ তোলার জন্যে

ট্যাক্সি চালাচ্ছে।" ভাবা যায়? কলকাতা কিংবা ভবানীপুরে যদু বাজারের পাশে, কিংবা পার্ক সার্কাসের মোড়ে আর পাঁচটা পুরুষ ড্রাইভারের সঙ্গে তরুণী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী ট্যাক্সী চালক অপেক্ষা করছে আর আপনি গাড়ির গেট খুলে ভিতরে বসতেই মধুর হাসি দিয়ে সম্ভাষন জানিয়ে সে প্রশ্ন করল—"কোথায় যেতে হবে?"

এ রাস্তা ও রাস্তা ঘুরতে ঘুরতে ট্যাক্সি চলেছে, মডার্ণ নক্সার বড় বড় বাড়ি, রাস্তার ধারে মাঝে মাঝেই ঘন সবুজের গাদাগাদি, মাঝারি লম্বাইয়ের গাছের জঙ্গল। নজর পড়ল, গাড়ি একটি পুলের ওপর উঠতে, রাস্তার ধারেই বলা যেতে পারে ২৫/৩০টি নরনারী বিবস্ত্র হয়ে কেউ শুয়ে আছে, কেউ বসে আছে, কেউ বা হেঁটে বেড়াচ্ছে। নিউহাউস বললেন, "বাগানটা দখল করেছে নিউডিস্টরা। নিউ-ডিস্টদের পশ্চিম জার্মানীর সব শহরেই দেখা যাবে। ওরা একটা সমস্যা। তবে বলার কিছু নেই, এটা তো স্বাধীনতার যুগ, বিবস্ত্র হবার স্বাধীনতা নিশ্চয় আছে ওদের!"

আমরা পৌঁছলাম সেই কুখ্যাত বার্লিন প্রাচীরের সামনে। লম্বা কংক্রীটের প্রাচীরে, বার্লিন দ্বিখণ্ডিত। রাজনীতির মেমো-রিয়াল বটে! প্রাচীরের গায়ের সিঁড়ি দিয়ে উঠে ও-দিকটা দেখা যায়। অনেকটা ফাঁকা জায়গা ছেড়ে তারপর আবার বড় বড় বাড়ি, পুরান ধরণের। শুধু ফাঁকা নয়, ঐ জায়গায় আছে প্রাচীর বরাবর কাঁটা তারের বেড়া, কোনও রকমে দেয়াল টপকে ওপারে পৌঁছেও নিস্তার নেই, কাঁটা তারের বেড়া ডিঙোতে হবে। তারপর? মেশিনগানধারী ইস্ট জার্মান পুলিস। কি দরকার বাবা ঐ বিপদের ঝুঁকি নেবার? প্রাচীরের এপারে একেবারে বাজার বসে গেছে, স্ন্যাক্স, পানীয়, মনিহারী—কি নেই, এমন কি কয়েকটি আরট স্কুলের ছাত্রছাত্রী তাদের আঁকা জল রঙের ছবিও বিক্রি করছে। বার্লিন ওয়াল আগে দেখেছিলাম সিনেমায়, সিনেমার পর্দায় কতটুকুই বা দেখা যাবে? ব্র্যাণ্ডেনবুর্গ গেটেরও ছবি দেখেছিলাম সিনেমা আর

স্থ একটি কেতাবে। ব্র্যাণ্ডেনবুর্গ গেট পড়েছে ইস্ট বার্লিন এলাকায়; যে রাস্তায় ঐ গেট তা কেটে দিয়ে গেছে বার্লিন ওয়াল। দেয়ালের এপাশ থেকেও গেট দেখা যায়। ওয়েস্ট বার্লিনের দিকে, ঐ রাস্তার ধারে এক বিরাট মনুমেন্ট। মস্ত ভাস্কর্যের পাদদেশে দণ্ডায়মান অ্যাটেনশান্ ভঙ্গীতে দুই রুশী গার্ড: অর্থাৎ মনুমেণ্টটি রুশী কর্তৃপক্ষের অধীনে। দূর থেকে দম দেওয়া পুতুলের মত মনে হচ্ছিল জ্যাণ্ডগার্ডদ্বয়কে, পুতুলের মতই নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তারা। প্রায় তখন বেলা ১২টা, দু ঘণ্টা পর পর গার্ড বদল হয়, গার্ড বদলাবার সময় হয়ে গেছে, একটু দাঁড়িয়ে যাওয়া যাক। দেখা যাক তামাসাটা কেমন! কিন্তু দশ মিনিট কেটে গেল, কোথায় নতুন গার্ড! নিউহাউস হতাশ হয়ে বললেন, "আজ কিছু একটা ঘটেছে, নিশ্চয় গার্ডদের শাস্তি হচ্ছে বেশি খাটিয়ে!" গার্ডরা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, মুখের ওপর তাদের সোজা কড়া রোদ্দুর।

অনেকক্ষণ ঘোরাঘুরির পর মধ্যাহ্নভোজের পালা। বেশ খিদে পেয়েছিল, কিন্তু কিছু বলতে পারছিলাম না, ব্যাপারটা যদি গাঁইয়া-পনা হয়ে পড়ে। রেস্তোরাঁর চেয়ারে শরীরটাকে ছেড়ে দিয়ে বললাম, "একটু জল খাব।"

"জল? কি বিয়ার পান করবেন বলুন ডার্ক না লাইট?"

মনে পড়ে গেল, জল চাওয়াটা ওদেশের রীতি নয়, সামলে নিয়ে "ডার্কটাই হোক!"

আহার্য যে কি আমার পছন্দ তা বলা মুস্কিল, জার্মান মেনু পড়ে কিছু বোঝা অসম্ভব আমার পক্ষে। সুপ দিয়ে শুরু করাই সমীচীন, কিন্তু কি সুপ? হায়রে কিছুই জানি না, দেশ থেকে রওনা হবার আগে কোনও অভিজ্ঞ ব্যক্তির কাছ থেকে তালিম নেওয়া উচিত ছিল! নিউহাউস, মেনু দেখে নিজেই স্থির করলেন তাঁর অতিথির কি ভালো লাগতে পারে। খেলাম বটে সব, কিন্তু এই বঙ্গদেশীয়টির কাছে একমাত্র আলুভাজাই ছিল তৃপ্তিদায়ক।

"কেমন খেলেন ?"

"দারুণ, দারুণ !"

সারা জার্মানীতে সর্বাপেক্ষা আধুনিক শহর পশ্চিম বার্লিন।

পশ্চিম জার্মানী এক নম্বর শহর বলে ধরা হয়। সুবিধে হয়েছিল নতুন করে শহর গড়ে তোলার। মিত্রশক্তি—রুশিয়া, আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড ফ্রান্স মিলে সে সুবিধে করে দিয়েছে। বোমা আর গোলার ঘায়ে সারা বার্লিন ধুলিস্মাৎ হয়েছিল। যখন নতুন করে শহরকে গড়া হল, পুরাতন বাড়ি ভেঙে ফেলার পরিশ্রম বেঁচে গেছে। পশ্চিম বার্লিনের অবস্থান কোথায় সেটা আমাদের দেশের অনেকেরই সঠিক ধারণা নেই। অনেকে মনে করেন জার্মানী সীমারেখার দ্বারা দুভাগ হয়েছে সেই রেখাই বার্লিন শহরকেও বিভক্ত করে সৃষ্টি করেছে পশ্চিম বার্লিন আর পূর্ব বার্লিন। আসলে কিন্তু তা নয়। পশ্চিম এবং পূর্ব বার্লিন দুইই পূর্ব জার্মানীর মধ্যে ; পশ্চিম জার্মানী থেকে প্রায় সওয়াশ কিলোমিটার দূরে। অর্থাৎ পশ্চিম বার্লিনের অবস্থা কতকটা দ্বীপের মত, চারপাশেই পূর্ব জার্মানী এলাকা। পশ্চিম বার্লিন বাসী যে দিকেই যাবেন, থাকতে হবে সীমার মধ্যে, নয়ত পূর্ব জার্মান পুলিশের হাতে নাস্তানাবুদ হওয়া অনিবার্য। এ বড় মজার অবস্থা। পশ্চিম জার্মানী থেকে পশ্চিম বার্লিনে পৌছতে হলে আসতে হবে উড়ে। যখন বার্লিন শহর, চার শক্তির পটসডাম চুক্তি অনুসারে, দ্বিখণ্ডিত হল, কোনও অসুবিধে হয় নি, কিন্তু রুশিয়ার অপছন্দ হতে লাগল অনেক ব্যাপার ক্রমশই। রুশিয়া রেগেমেগে তুলে নিল ঐ কংক্রীটের প্রাচীর। আর চারপাশে বসল কড়া প্রহরা, যাতে কোনও জিনিসপত্র খাবারদাবার পশ্চিম বার্লিনে পৌছতে না পারে স্থল পথে। খাবার পৌছান বন্ধ মানে পশ্চিম বার্লিনবাসীদের অনাহারে মৃত্যু। কিন্তু আমেরিকা, ব্রিটেন, আর ফ্রান্স কি অত সহজে ছেড়ে দেবার পাত্র ? তাদের হাওয়াই জাহাজ নেই ? চলল এয়ার লিফট। মাছ, মাংস, দুধ, আটা, ফল,

সঙ্গী আসতে লাগল পশ্চিম জার্মানী থেকে পশ্চিম বার্লিনে এরো-প্লেনে করে। পশ্চিম বার্লিন বাসীর কোনও অভাব রইল না। রুশিয়ার এ চাল বানচাল! বছর খানেক পর চারপাশের প্রহরা কড়াকড়ি কিছুটা শিথিল হল বটে কিন্তু নিয়ম কানুন উঠে গেল না। পশ্চিম বার্লিনীরা দিব্যি আনন্দ করে কাটিয়ে যাচ্ছে দিন, আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স আছে তাদের রক্ষা করতে, ভয় কী? পুলিশ, টাকা-পয়সা, পৌর ব্যবস্থা ইত্যাদি সব হয়ে থাকে পশ্চিম জার্মান সরকারের তত্ত্বাবধানে। পশ্চিম বার্লিনের মানুষ খুব নির্ভাবনায়, নিরাপদে আছেন; কোনও বিপদ আসতে পারে একথা তাঁরা মনেই করেন না। কিন্তু রুশিয়া ইচ্ছা করলে যে কোনও সময় অবশ্যই অঘটন ঘটিয়ে দিতে পারে। বর্তমানে, যা ওপর ওপর দেখা যায়, পশ্চিম বার্লিন আর পূর্ব বার্লিনের সম্পর্কটা খুব একটা শত্রু ভাবাপন্ন নয়; পাঁচি-লের এপার থেকে ওপারে যাবার অনুমতি চাইলে তা যে সব সময় নাকোচ হয়ে যাবে এমন কথা জোর দিয়ে বলা চলে না। এ অধম ওপারে যাবার অনুমতি পেয়েছিল এবং সে ব্যবস্থা হয় পশ্চিম বার্লিন কর্তৃপক্ষেরই প্রচেষ্টায়।

গাড়ি প্রবেশ করল চেক পয়েন্ট চার্লিতে। পূর্ব বার্লিন সিকিউ-রিটি বাহিনী সামনে এসে গেলেন, পাশপোর্ট দেখতে চাইলেন। ভারত সরকার প্রদত্ত পাশপোর্ট, জার্মান ডিমক্র্যাটিক রিপাবলিকের আপত্তি থাকার কোনও কারণ নেই। ভারত সরকার আর পূর্ব জার্মান-সরকার তো বন্ধু! কিন্তু পশ্চিম বার্লিনের গাড়িটায় কিছু আপত্তিকর থাকতেও পারে! ভিতর বার চাকার টায়ারের খাঁজ খোঁজ সব তন্ন তন্ন করে সার্চ করে তবে অফিসাররা ছাড়পত্র দিলেন। সঙ্গে তখন আর নিউহাউস নেই, পূর্ব বার্লিনে পৌছে সঙ্গী পেলাম পূর্ব বার্লিনবাসী এক বয়স্কা মহিলাকে। ষাটের কাছাকাছি বয়স হবে। খুব রসিক, খুব হাসি খুশি! প্রথমেই মহিলা ধন্যবাদ জানালেন কারণ চারদিকে ঝকঝকে সূর্যের আলো, যেটা ওদেশে

দুষ্প্রাপ্য। আমি ভারতবাসী, আমিই যেন ঐ সূর্যালোক সঙ্গে নিয়ে পূর্ব বার্লিন পৌঁছেছি। ধন্যবাদটা গ্রহণ করলাম। "আপনারা ইস্ট বার্লিনে বেশ সুখে আছেন তো?"

"নিশ্চয়। আমাদের মত সুখে আর কে থাকতে পারে এ জগতে? আমরা আজ স্বাধীন। পৃথিবীর সব দেশে বেকার আছে কিন্তু পূর্ব জার্মানবাসীরা জানতে পারে বহিরাগত সংবাদ থেকে বেকার কাকে বলা হয়। পূর্ব বার্লিনে একজনও বেকার নেই। মেয়ে পুরুষ সবাই এখানে কর্মী। কথা বলতে বলতে কোন সময় ঢুকে পড়েছি শহরের কেন্দ্রস্থলে। গত বিশ্বযুদ্ধের সময় ভদ্রমহিলা ছিলেন যুবতী এক মুক্তি ফৌজী। অনেক ঘটনার সাক্ষী এই স্ত্রীলোকটির কথায় কথায় প্রকাশ হয়ে পড়ছে উষ্মা তৎকালীন নাৎসী নেতাদের প্রতি। কী সাংঘাতিক অত্যাচারই না চলেছিল সেই সময়। "ঐ যে লাল বাঁধান চত্তরটা দেখতে পাচ্ছেন, ওরই ওপর হয় পুস্তক দাহ কাণ্ড। জগৎ বিখ্যাত পণ্ডিতদের মহামূল সব গ্রন্থ লাইব্রেরী থেকে টেনে বার করে পুড়িয়ে ফেলা হল!" তাঁদের তখন রণং দেহী মূর্তি। যুদ্ধ না করলে দেশ বাঁচবে না, যুদ্ধ বিরুদ্ধ কথাবার্তা ছাপার হরফে যেখানে যা আছে সব পুড়িয়ে ফেল, যুদ্ধের ভয়াবহতার বর্ণনা আছে যে কেতাবে তা যেন কোনও তরুণের হাতে না পড়ে। 'এরিখ মারিয়া রেমার্কের অল কোয়াইট অন দি ওয়েস্টার্ণ ফ্রন্ট' ছাই হয়ে গেল। শুধু রইল হিটলারের গুণগান, নাৎসী মতবাদের মাহাত্ম্য আর যুদ্ধ চাই যুদ্ধ চাই রব। সবার হাতে তখন হিটলার প্রণীত মাইন-কাম্ফ্। ব্রাণ্ডেনবুর্গ গেটের নিচে দিয়ে মার্চ করে চলেছে সৈন্যরা রণদামামা বাজিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে। সাঁজোয়া গাড়ি, ট্যাঙ্ক, বিধ্বংসী কামান, ইউবোট আর লুফটওয়াফের বিমান তৈরী করতে তখন সব কলকারখানা ২৪ ঘণ্টা ব্যস্ত।

পূর্ববার্লিনের দিক থেকে আমরা ব্র্যাণ্ডেনবুর্গ গেটের সামনে দাঁড়িয়েছি, স্পষ্ট চোখে পড়ছে গেটের মাথার মূর্তিগুলো, মহিলা বলে

চলেছেন, "যুদ্ধ বাধলো, জিতলামও আমরা প্রথম দিকটা, কিন্তু তার পর যখন ঝাঁকে ঝাঁকে বোমারুরা গুঁড়িয়ে দিতে লাগল আমাদের ঘর সংসার তখন কি করতে পেরেছি আমরা ? ১০ থেকে ১৪ বছরের বালক আর ১৫ থেকে ১৮ বছরের মেয়েরা হিটলার ইউথ, ঠেলে দেওয়া হল তাদেরও যুদ্ধের মুখে। শুধু আপশোষ আর চোখের জল ফেলা ছাড়া আর কি ছিল আমাদের করার ? সারা শহর দাঁড়াল কেবল ভাঙা চোরা ইট পাথরের স্তূপে। কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে বিদেশী বন্দীদের, ইহুদিদের না খেতে দিয়ে শুকিয়ে মারার প্রতিফল আমরা ভোগ করেছি উচিত মত। না আছে খাবার না আছে পরার, সারা শহরে হাহাকার। হাজারে হাজারে মরছে জার্মান, মেয়ে, বুড়, শিশু, জওয়ান কারোর রেহাই নেই। কে দায়ী ? যুদ্ধের শেষ হবে একদিন না একদিন, কিন্তু কোথায় থাকব তখন ? জার্মান জাতিকে মেরে ফেলা কি অত সহজ ? আমরা মরিনি। গড়ে তুলেছি আমরা বার্লিন শহর নতুন করে, দেখছেন তো ? তখন কোথায় পাব টাকা আর কোথায় বা পাব বাড়ি তৈরীর ইট ? ভাঙ্গা স্তূপ থেকে গোটা ইট বার করে পরিষ্কার করে নিয়ে তাই দিয়ে গড়া, ঐ যে দেখছেন, ওইসব বাড়ি, বোঝা যায় কী ? বর্তমানে আমাদের কিছুরই অভাব নেই—না অর্থের, না কলকারখানার, না খাদ্যের। তবে অপচয় যাতে না হয় সেদিকে আমরা সর্বদা নজর রাখি।

এসে পড়লাম পূর্ব বার্লিনের গ্রীন ডিসট্রিকট-এ। রাস্তার পাশে ঘন জঙ্গল, আকাশ ছুঁওয়া গাছগুল। গাড়ি থামল গেটের সামনে, গেট পেরিয়ে মস্ত বাগান—আমাদের শিবপুর বোটানিকাল গার্ডেনের মত। তবে বোটানিকাল গার্ডেনে অমন ভাস্কর্য দেখা যাবে না। বিরাট এক ব্রোঞ্জের মাতৃমূর্তি। ক্রন্দনরতা। লক্ষ লক্ষ সন্তান তাঁর বলি হয়েছে, মা কাঁদবেন না ? মূর্তিটির স্রষ্টা এক রুশী শিল্পী। দূরে আরও একটি ভাস্কর্য, প্রকাণ্ড বড় সৈনিক মূর্তি, ক্রোড়ে তার এক শিশু আর দক্ষিণ হস্তে ধৃত তরবারিটি নিম্ন মুখী, অর্থাৎ যুদ্ধের

শেষ। কোলের শিশুটি নব জীবনের প্রতীক। সঙ্গিনী ব্যাখ্যা করলেন সৈন্য মূর্তির তাৎপর্য। "ঐ শিশুটি কিন্তু নেহাতই কাল্পনিক নয়, ওর এখন বয়স ৩৩, প্রতি বছরেই ওর সঙ্গে আমার দেখা হয়। রুশী সৈন্যরা যখন দখল করল বার্লিন শহর, ওকে এক ধ্বংসস্তূপ থেকে কুড়িয়ে পাওয়া যায়। সারা শহর শ্মশানের চেহারা, মরা আর আবর্জনার ঢিবি তারই মধ্যে বসে কাঁদছিল শিশুটি। ওকে বড় করে তুলেছেন প্রাহা শহরের এক ভদ্রমহিলা। লেখা পড়া শিখে ও এখন মস্ত এক ইঞ্জিনিয়ার। কার ছেলে কোথায় বাড়ি কোনই পরিচয় নেই। নাই বা থাকলো, ওর সবচেয়ে বড় পরিচয় ও পূর্ব জার্মানীর নাগরিক।" ঐ মূর্তির সামনে ঘন মখমলের মত ঘাস—যেন চারিটি সবুজ কার্পেট পরপর বিছিয়ে রাখা। একেকটি কার্পেটের নিচে শুয়ে আছে চির নিদ্রামগ্ন পাঁচ হাজার সৈন্য—গ্রেট ভিকটরির ২০০০০টি উৎসর্গ। বছরে একটি দিন দলে দলে আসে মানুষ ঐ ঘাসের উপর ফুল রাখতে। ইঞ্জিনিয়ার সাহেবও আসে। ফুল রাখে ওখানে সদ্য বিবাহিত দম্পতিরাও। সব দেখে শুনে সত্যিই মনটা বেশ নরম হয়ে পড়েছিল, খানিক্ষণ বসে রইলাম এক পাথরে চুপটি করে। অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম, চটকা ভেঙ্গে গেল মহিলার কর্কশ পুরুষালী কণ্ঠস্বরে, "আরও বহু জিনিষ দেখা যে বাকি রয়েছে এখনও, উঠে পড়ুন।"

দিনটা ছিল রবিবার। ভদ্রমহিলা বললেন, "আজ ছুটি, সবাই বেরিয়ে পড়েছে বাড়ি থেকে। শহরের বাইরে আউটিং-এ।" ট্রাম চলছে, বাস চলছে, সব ফাঁকা ফাঁকা! আমাদের কলকাতায় কি রবিবার কি অন্যবার, ট্রাম, বাস, ট্রেনের অবস্থা একবার ভাবুন! বেড়াবার সব সখ উড়ে যাবে। শহরের মধ্যে একটি বিরাট বাড়ির সামনে গাড়ি থেকে নামতে বলা হল, কত বড় বাড়ি তার আন্দাজ পরে হবে। বাড়িটার চারপাশে জল। শুনলাম বাড়িটি নাকি দাঁড়িয়ে আছে এক দ্বীপের ওপর, তাই চার সীমানায় জল। এক নদীর মধ্যে

ঐ দ্বীপ। কিন্তু নদী দ্বীপ এসব কথা, যতক্ষণ না গাছপালা, কাঁচা মাটি দেখতে পাওয়া যায়, বিশ্বাস হবে? প্রাকৃতিক পরিপ্রেক্ষিতের চিহ্ন নেই, পুরো শহুরে আবহাওয়ায় ঐ বাড়ি—পেরগামন মিউজিয়াম একটা পুল পেরিয়ে মিউজিয়ামের প্রবেশপথ। গ্রীসের শহর পেরগামনের সেকালের স্থাপত্য শিল্পের আর ভাস্কর্যের কিছু নমুনা ঐ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত। অ্যাসিরিয়া বাবিলোন ইত্যাদি ঐতিহাসিক অঞ্চলেরও কিছু কিছু শিল্প নিদর্শন সংরক্ষিত। দুপাশের দেয়ালের বহুরঙা ইটের সিংহ নক্সা দেখতে দেখতে পৌঁছাতে হবে এক মস্তবড় ফটকের সামনে। ফটকটি পেরগামন শহরের বাজারের, তুলে এনে এখানে বসান হয়েছে মিউজিয়ামের ভিতর। গেটটি উচ্চতায় আমাদের এখানকার কোনও তিন তলা বাড়ির সমান হবে। এবার বুঝুন ঐ সংরক্ষণাগারটির আয়তন কি হতে পারে। মিউজিয়ামের সিলিং কংক্রীটের ঢালাই করা নয়, ট্রান্সপারেন্ট গ্লাস, যাতে সূর্যালোকের ভিতরে প্রবেশে কোনও বাধা না হয়। কয়েক হাজার বছরের আগের ঐ স্থাপত্য, বাজারের ফটকটি, অসাধারণ নৈপুণ্যের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। যেমন কারুকার্য, তেমনই ইঞ্জিনিয়ারিং। পূর্ণ স্তম্ভিত হওয়া তখনও বাকি! এবার এক মস্ত উঠানের মধ্যিখানে, মাথার ওপর সেই কাচের ছাদ। এক পাশে সিঁড়ির ধাপ পরপর। সিঁড়ির ওপর চাতাল, চাতালের ওপর থাম দিয়ে ছাউনি ধরে রাখা, উঠানের দুপাশের দেয়াল থেকে ফুঁড়ে বেরিয়ে আসছে অসংখ্য মর্মর মূর্তি। নারীর সঙ্গে পুরুষের যুদ্ধ। ভয়ঙ্কর যুদ্ধ! নারী হলেন দেবী আটেনা আর পুরুষ টিটান। আমাদের মা দুর্গার অসুর নিধন দৃশ্য স্মরণ করিয়ে দেয়। বলতে গেলে, দুর্গা ভঙ্গীতেই টিটানকে কাবু করছেন আটেনা। তবে আটেনার দশ হাত নয়, দুটি হাত, আর টিটান কোনও দানব বিশেষ নয় অসাধরণ রূপবান এক পুরুষ। পুরুষের আদর্শ রূপ বলতে যা বোঝায় টিটানের চেহারা তাই। আটেনা আর টিটানের লড়াই, একটি আধটি নয়, বহুত। অবিশ্বাস্য

উৎকর্ষ! চোখ ফেরান যায় না। সমকালীন ভাস্কর্যের কাজে কি ও মুন্সিয়ানা দেখতে পাওয়া যাবে? শারীর স্থান, রূপবোধ আর ক্রিয়া কৌশলে খুঁত ধরার সাধ্যি আছে কার? যীশুখৃষ্ট জন্মাবার কয়েক হাজার বছর আগের মানুষের কীর্তি ঐ ভাস্কর্য। সেকালের মানুষ কোত্থেকে পেয়েছিল ঐ বুদ্ধি আর ঐ শক্তি? আমরা একালের মানুষতো বড়াই করি বিজ্ঞানে, শিল্পে, সাহিত্যে দারুণ এগিয়ে গেছি। কিন্তু যখন সেকালের মানুষের সৃষ্টির সামনে দাঁড়াই, তখন বুঝি কত ছোট আমরা। ওঁদের বিদ্যাবুদ্ধির ধারে কাছেও পৌঁছতে পারিনি, ডিঙিয়ে যাওয়া তো দূরের কথা। মূর্তিগুলি কেমনভাবে যে ঐ দেয়ালের সঙ্গে জোড়া আছে বোঝা যায় না; রিলিফ বা হাই রিলিফ বলতে যা বোঝায় টিটান আর আটেনা তা নয়, জায়গায় জায়গায়, গোটা ফর্ম সৃষ্টি করে যেন তা দেয়ালের গায় বসিয়ে দেওয়া হয়েছে; সামনে বেরিয়ে আছে অনেকখানি, প্রায় ঝুলন্ত অবস্থাই বলা যেতে পারে। মানুষ প্রমান প্রস্তরমূর্তি কি জোরে ১০/১২ ফুট ওপরে ঐভাবে থাকতে পারে বোঝা ভার। পেরগামন মিউজিয়াম ১৯৩০ সালে খোলা হয়, তৈরী হওয়া শুরু হয়েছিল তারও বেশ কয়েক বছর আগে। গ্রেট ওয়ারের সময়ে সব সরিয়ে ফেলে রাখা হয়েছিল নিরাপদ কোনও জায়গায়।

ইস্ট বার্লিন আর ওয়েস্ট বার্লিনের মধ্যে পার্থক্য অনেক, ইস্টে লোকসংখ্যা খুব কম, যদিও ইস্ট বার্লিন সারা ইস্ট জার্মানীর রাজধানী। বাড়িগুলো আধুনিক হলেও, ওয়েস্টের মত অত আধুনিক নয়, ট্রাডিশন স্বোচ্চার। কি সরকারী অফিস, কি সংগ্রহশালা, কি বাসগৃহ সবেই নতুন কিছু দেখাবার চেষ্টা নেই। সমকালীন স্থাপত্য যে একেবারেই অনুপস্থিত তা অবশ্যই নয় তবে ওয়েস্টের তুলনায় নগণ্য।

মধ্যিখানের পাঁচিলের এপার আর ওপার, কিন্তু মেজাজে কতটা ফারাক। পশ্চিম বার্লিন সদা উৎসব মুখোরিত। আলোর বন্যা

আনন্দের ফোয়ারা। ইউরোপা সেণ্টারের ফুটপাথ ছুটির দিনে ফাঁকা থাকে না, অস্থায়ী দোকানীদের ভীড় প্রায় আমাদের চৌরঙ্গীর মতই। শুধু ফেরিওয়ালারাই ফুটপাত দখল করেনি, রেস্তোরাঁগুলোর অর্ধেকের বেশী চেয়ার পাতা থাকে ঐ ফুটপাতের ওপর, রোদ্দুর দেখলে কেউ ভিতরে বসবে না, বসবে খোলা আকাশের নিচে। আর্টিস্টরা ফুটপাথে বসে প্রতিকৃতি আঁকছে, ১০ থেকে ২০ মার্ক দক্ষিণা। ট্যাক্সি ড্রাইভার আর অফিসের বড় সাহেবের চেহারায় কোনও পার্থক্য নেই, ভদ্র বংশেরই সন্তান ট্যাক্সি ড্রাইভার। যে মেয়েটিকে ট্যাক্সি চালাতে দেখা গেছে আগের দিন তাকেই আবার দেখা যাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ল কলেজ কিংবা ফিলজফি কিংবা কেমিস্ট্রি ক্লাসে। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর এদের নামের সামনে বসবে ডকটর শব্দটি। কেউ কেউ পাড়ি দেবে বিদেশ, কেউ বা থাকবে দেশেই। ব্যাপারিরা খরিদ্দারের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যে মজার মজার সব পোশাক পরে, এক ছোকরা, মুখ দেখে বোঝা যায় ২৫/২৬-এর বেশী বয়স তার কোনও মতেই হতে পারে না, প্রকাণ্ড বড় ভুঁড়ি উঁচু করে, কালো লম্বা কোট পরে, মাথায় কালো টপ হ্যাট চাপিয়ে কৃত্রিম ঝোলা গোঁফ লাগিয়ে মিষ্টি মিষ্টি হাসছে; একশ বছরের প্রাচীন 'পাঞ্চ' পত্রিকা খুললে ঐ রকম চেহারায় মহাশয়দের দেখা যায়। নিউহাউসের পাশে পাশে হেটে চলেছি, পরনে ফুলপ্যাণ্ট আর পুরোহাতা কলারওয়ালা ঘন ব্লু রঙের গেঞ্জি, আমাকেও জোকারের মতই দেখাচ্ছিল নিশ্চয়। নিউহাউস ফুটপাথের ধারে রাখা একটি গাড়ির পাসে এসে দাঁড়ালেন, "এই যে দেখছেন গাড়িটা, সামনের কাচের ওপর আঁটা কাগজে লেখা ৭০০০ মার্ক। অর্থাৎ ৭০০০ মার্ক দাম দিলে গাড়ির মালিক হয়ে যাবেন আপনি। আপনি কি রাজী আছেন? গাড়িটি আমার গৃহিনীর, তিনি বিক্রি করতে চান, কিন্তু যা দাম হেঁকেছেন উনি, কেউ নেবে না ও গাড়ি।" পরপর আরও গুটি কয়েক গাড়ি দণ্ডায়মান, কোনওটির গায়ে লেখা ১৫০০০ মার্ক, কোনওটির বা ৫০০০

মার্ক। সেকেণ্ড হ্যাণ্ড গাড়ি বিক্রি করার ঐ হল নিয়ম ওখানে। পথচারীর নজরে পড়লে, পছন্দ হলে, কেনা-বেচা হবে। জার্মানীর অন্য সব শহরে মারসেডিজ বেঞ্জ আর ভক্স ওয়াগনের ছড়াছড়ি, বিদেশী গাড়ি কদাচ কখনও চোখে পড়ে, কিন্তু পশ্চিম বার্লিনে, মার্কিন, ইংরাজ, ফরাসী গাড়ির কিছু কমতি নেই, কারণ ঐ তিন শক্তির আধিপত্য জোরদার ওখানে। পূর্ব জার্মানীর নিজস্ব গাড়ি আছে বৈকি, কিন্তু তা পশ্চিমের মারসেডিজের মত অত উচ্চমানের কিনা বলা মুস্কিল। একটু চা-চা মন করছিল, নিউহাউস জানালেন, "নো প্রোবলেম—।" ফুটপাথে সাজান রেস্তোরাঁর চেয়ারে বসে অর্ডার হল, একটা চা আর আরেকটা দুধ ছাড়া কফি। বিল এল কত? সাড়ে পাঁচ মার্ক। ২২ টাকা আমাদের মুদ্রায়। লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন, বার্লিনের সেরা সেরা রেস্তোরাঁয় খেয়ে বেড়াচ্ছি লাঞ্চ, ডিনার, ড্রিংক্স, নিউহাউস আমার গৌরী সেন। অবশ্য পরে সব উসুল করবেন নিউহাউস ইন্টের নাশিওনের কাছ থেকে। নিউহাউসের ভারতীয়দের সম্বন্ধে অল্পবিস্তর জ্ঞান আছে, এক সময় বোম্বাই-এর কার্টুনিস্ট মারিও তাঁর অতিথি হয়েছিলেন। প্রত্যেক ডিনার কিংবা লাঞ্চ খাবার আগে নিউহাউসের প্রশ্ন, "কি খাবেন বলুন, চিকেন, ফিস, মিট?" এসে পর্যন্ত মাংস খেয়েই রয়েছি, মৎস্য ভক্ষণের বাসনা প্রকাশ করে ফেললাম। বার্লিনে তাজা মাছ কোথায় পাওয়া যাবে, যা পাওয়া যায় তা পশ্চিম জার্মানী থেকে চালান, বহুদিন ধরে ফ্রিজে ঠাণ্ডা করা। পূর্ব জার্মানীর নদী বা পুষ্করিনীতে যা মাছ পাওয়া যায় তা পশ্চিম বার্লিনবাসীদের কপালে জোটে না। নিউহাউস চিন্তায় পড়লেন। এক যুগোল্লাভ রেস্তোরাঁয় ট্রাউট মাছ রান্না হয়। ট্রাউট পশ্চিম বার্লিনের ছোটখাটো জলাতেও পাওয়া যায়, সুতরাং বাসী হবার সম্ভাবনা কম। যুগোস্লাভ রেস্তোরাঁয় ট্রাউট ভাজা এল সামনে, প্রায় কিলোখানেক সাইজের এক গোটা ট্রাউট। গোটাটা খেতে হবে? সঙ্গে ভাত রুটি কিছু

না, কাঁচা শাকপাতা, আলু ভাজা আর ঐ মাছ। আমার বাঙালীর পেট, ২৫ গ্রাম সাইজের এক টুকরো, বড় জোর দু টুকরো মাছ খাওয়া অভ্যাস, সহ্য হবে কেন? হল মুস্কিল, রাত্রে পেট ভুটভাট। সঙ্গে অষুধ ছিল ভাগ্যিস, বাড়াবাড়ি হবার আগেই তা সেবন করে অস্বস্তি হতে নিস্তার পেলাম। অসুস্থ হলে ইন্টের নাশিওনের দায়িত্ব সুস্থ করার, কিন্তু বিদেশ বিভুঁয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে থাকা নিশ্চয় যুক্তি সঙ্গত নয়। পরের দিন মাছ খাবার লোভ দমন করে বললাম মাংসই চলুক। যে সব বিখ্যাত কুইজিনে খাচ্ছি সেখানে ভাতের কথা তুললে তারা ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে মুখ পানে। মুরগী খাওয়াবে নিউহাউস, মুরগী রান্নার শ্রেষ্ঠ রেস্তোরাঁয় পদার্পণ করেই ধাক্কা—কাউন্টারের মাথায় খড়ের চাল তৈরী হয়েছে, তার ওপর দুটি খড়ভরা মরা শুকনো কুক্কুট, একটি মাদি একটি মদ্দা, বসিয়ে রাখা, অর্থাৎ দেহাতি পরিবেশ! রেস্তোরাঁটি ইউরোপা সেন্টারে, সেখানকার আবহাওয়ায় আধুনিকতম মেজাজ, সেখানে গ্রাম সৃষ্টির কি ব্যাকুল প্রয়াস! দেওয়ালে হাত দিয়ে মাটি লেপার মত ভাবে প্লাস্টার জমানো, গ্রাম্য চালাঘরের অনুকরণ! মম ব্যক্তিগত নন্দনতত্ত্বে ব্যাপারটা আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়। নিউহাউসকে মতামতটি জানাতে তিনি বললেন, "এর আগে কেউ কখনও তো এভাবে দেখেনি, সত্যিই চারপাশে কমপিউটর আর এসকেলেটর, তার মধ্যে গ্রাম-জার্মানী, তালকাটা সুরই বটে।" ওয়েটার প্রকাণ্ড বড় বড় দুটি মুরগীর রোস্ট দু প্লেটে ধরে টেবলে রাখল। অসম্ভব! ঐ গোটা মুরগী খাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। নিউহাউস পাশের টেবলের দিকে আড় চোখে দেখালেন, এক ছোকরা আমাদের দুটি মুরগী জোড়া করলে যা দাঁড়াবে তার থেকেও বড় এক শুকরখণ্ড ভক্ষণে মনোনিবেশ করেছে, তৃপ্তি তার চোখে মুখে উপচে পড়ছে। এরা কি রাক্ষস? ঐ মাংসের পর আইসক্রীম হবে, সঙ্গে তো ড্রিংকস চলেইছে। অর্ধেকের বেশী মুরগীটাই ফেলা গেল আমার পাতে।

শারলোটেন বার্গ প্যালেস। ঘোড়ায় চড়ে দাঁড়িয়ে আছেন রাজা ফ্রেডরিক। ফ্রেডরিক ছিলেন প্রুশিয়াধিপতি। তখনও একালের জার্মানীর সৃষ্টি হয়নি। ছোট ছোট কিছু রাজত্ব একত্রিত হয়ে জমা বাঁধল জার্মানী। প্রুশিয়া সেই ছোট রাজ্যের অন্যতম। ব্রোঞ্জের অশ্বারোহী রাজমূর্তি স্বাগতম জানায় আগন্তুককে। রাজা মাত্রেই সৌখীন কিন্তু ফ্রেডরিকের সৌখীনতা ছিল একটু বেশী রকম। শারলোটেন বার্গ সজ্জিত হয় ফ্রেডরিকের পছন্দ মত। মস্ত বাগান, রাজবাড়ির বাগান। প্রাসাদের ভিতর ঢুকতে হবে, রোমশ চপ্পল দেওয়া হল পরতে। পায়ের জুতো খোলার প্রয়োজন নেই, স্বচ্ছন্দে জুতো শুদ্ধ পা চপ্পলের ভিতর ঢুকে যায়। চপ্পল না পড়লে রাজবাড়ির মধ্যে প্রবেশ নিষেধ; মামুলি জুতোর ঘায় মেঝে চোট খেয়ে যেতে পারে। কিন্তু সে কি অসুবিধে, হাঁটা যায় ওভাবে? পা ঘষে ঘষে সব দর্শকই চলেছেন, মনে হয় কাঠের পালিশ করা মেঝে আরও পালিশ করিয়ে নেবার ও একটা কৌশল। নানা ব্যবহার্য, আসবাবপত্র আর সেই সঙ্গে দেয়ালে টানান বড় বড় পেইন্টিং পরপর ঘুরে দেখতে দেখতে এগোচ্ছি। সঙ্গে রয়েছেন শারলোটেনের গাইড, অনর্গল বকে যাচ্ছেন তিনি, আমি একবর্ণও বুঝছি না। জার্মান ভাষায় বক্তৃতা হয়ে চলেছে, দর্শক আমি একাই নই, আরও দশ বার জন, কয়েকজন জাপানীও আছেন। জাপানীদের অবস্থা আমার মতই, গাইডের কথা বুঝছেন না তাঁরাও। গাইড ইংরেজী শব্দ উচ্চারণ করবেন না। কি তাঁর কথার তোড়! মুখস্থ করা বুলি!

শারলোটেনের সামনে নেফেরতিতি মিউজিয়াম। সম্রাজ্ঞী নেফেরত্তিতির মূর্তি, চুনে পাথরের ওপর রং করা ভাস্কর্য, হাজার হাজার বছর আগের মিশরীয় কলাকৌশলের নিদর্শন উপস্থাপিত নেফেরতিতিতে। জনৈক আমেরিকান পণ্ডিতের এক গ্রন্থে নেফেরতিতির এই মূর্তিটি বার্লিন মিউজিয়ামের সংগ্রহ বলে উল্লেখ আছে, শুধু

নেফেরতিতিই নয় পেরগামান সংগ্রহশালার আটেনা-টিটান মর্মর ভাস্কর্যগুলিও বার্লিন মিউজিয়ামের সংগ্রহ বলে ঘোষিত, ঐ গ্রন্থে। বার্লিন মিউজিয়াম বলতে বোঝায় 'ভালেম'। সাহেব পণ্ডিত বার্লিনের সব কটি মিউজিয়ামকেই বার্লিন মিউজিয়াম বলে চালাতে চেয়েছেন মনে হয়। নেফেরতিতি কেবলমাত্র মিশরীয় আর্টেরই সংরক্ষণাগার। সার সার বেশ কয়েকটি মমিও শায়িত। হাজার হাজার বছর আগের শব ঐ মমিরা—অস্তিত্ব আছে কিন্তু দেহ বলতে যা তা কষ্টি পাথরের বলে দিব্যি চালিয়ে দেওয়া যায়। অসংখ্য ছোট বড় প্রস্তর মূর্তি, মৃত্তিকা পাত্রাদি, ব্যবহার্য আর সৌখীন বস্তু—মিউজিয়াম ঠাসা। নিউহাউস মিউজিয়ামের ভিতর প্রবেশ করেননি, কিছুক্ষণের জন্যে আমাকে ছেড়ে দিয়েছিলেন একা। রাস্তায় দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াচ্ছিলেন তিনি। মিউজিয়াম দেখে আমার বেরোতে সময় লাগবে—তাঁর আন্দাজ। সামনা সামনি হতেই চিরুনিটা লুকিয়ে ফেলার চেষ্টা করলেন, কিন্তু আমি দেখে ফেলেছি। লজ্জার হাসি হেসে বললেন, "অনেক দিন চুল কাটা হয়নি, চুলটা কাটতে হবে। জানেন বার্লিনে চুলকাটার চার্জ ৩৫ মার্ক।" ৩৫ মার্ক মানে আমাদের দেশের প্রায় ১৪০ টাকা। সর্বনাশ। ওদেশের পুরুষদের মাথায় বড় বড় চুল রাখার কারণটা ধরতে পারা গেল। আমাদের দেশের ছেলে ছোকরারা বড় বড় চুল রাখছে, যেহেতু সাহেবরা বড় চুল রাখে।

পশ্চিম বার্লিনে একটা কি যেন টিভি ট্রানজিসটার ইত্যাদির প্রদর্শনী চলছিল, ও ব্যাপারে আমার আগ্রহ শূন্য, গেছি জার্মানীতে ছবি আর ভাস্কর্য দেখতে, টি ভি দেখার কি প্রয়োজন? তা তো আর সঙ্গে নিয়ে আসা যাবে না! পালাস হোটেলে দেশ বিদেশের ব্যবসাদারদের ভীড় তখন, এসেছেন তাঁরা টিভি প্রদর্শনী দেখতে এবং নিজ নিজ দেশের বাহাদুরী দেখাতে। বহু জাপানী এসেছেন। হোটেলের লাউঞ্জে বসে দেখতে পাই ব্যবসায়িক লেনদেন চলছে,

আলোচনা চলছে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে জাপানীরা বিক্রেতা আর ইউরোপীয়রা ক্রেতা।

ব্রেকফাস্ট খাবার সময় আর কিছু বলতে হয় না, গ্রীলে উপস্থিত হলেই 'গোটেন মরগ্যান' জানিয়ে বয় সামনে ডিম সিদ্ধ রেখে যায়। কোনও অসুবিধে নেই। কিন্তু প্রতি প্রাতে ঘর বন্ধ করার সময় একই ব্যাপার, চাবি ঠিক লাগে না। হাসি মুখে সুপ্রভাত জানিয়ে মেইড প্রতিবারই দেখিয়ে দেয় কেমনভাবে চাবি ঘুরিয়ে বন্ধ করতে হবে। সে আমার ভাষা বোঝে না, আমিও তার ভাষা বুঝি না।

কাঁটায় কাঁটায় ন'টার সময় নিউহাউস এসে লাউঞ্জের সোফায় বসে থাকেন খবরের কাগজ সামনে ধরে। সুপ্রভাত বিনিময় করে আমরা বেরিয়ে পড়ি সেদিনের সফরের উদ্দেশ্যে। লক্ষ্য করি ট্যাক্সি ড্রাইভার যদি মহিলা হয়, নিউহাউস গিয়ে বসেন তার পাশের সীটে, আমাকে বসতে হয় পিছনে। ট্যাক্সি না চেপে এক সকালে চলেছি পায়দল, সেই ভাঙা চার্চের সামনে জনা চার-পাঁচ কাশ্মিরী, হাতে লেখা প্লাকার্ড, সতরঞ্চি পেতে শুয়ে আছে ফুটপাথের ওপরেই তারা। অর্থাৎ প্রথম দিনের ট্রাফিক জ্যামের কারণ সেই অনশন তখনও চলছে। "ভারত কাশ্মীর ছাড়ো!" ও আওয়াজ তো কাশ্মীরে দেওয়া উচিত ছিল, বার্লিনে কে শুনবে? বার্লিনে কাফ্রি যুবকদের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়, বেশীর ভাগ ছাত্র। এরা শ্বেতাঙ্গিনীদের খুব ফেবরিট। ফেবরিটিজম থেকে দাম্পত্য জীবন প্রতিষ্ঠিত হতেই পারে। আসার সময় এরোপ্লেনে যে বিচ্ছু কৃষ্ণকায় বাচ্চাটিকে দেখেছিলাম তা নিশ্চয় এক ফেবরিটিজমেরই ফল। কাফ্রিদের সম্বন্ধে পশ্চিম জার্মান সরকারের বিশেষ আপত্তি নেই, কিন্তু এশিয়াবাসীদের নিয়ে তাঁদের মাথার যন্ত্রণা ভীষণ। দলে দলে এশিয়ার মানুষ জার্মানী পৌঁছচ্ছে। তারা ভিক্ষা করে রাজনৈতিক আশ্রয়, কিন্তু আসল কথা কাজ-কারবারের ধান্ধা। এরা সংখ্যায় যে রেটে বাড়ছে কিছু দিনের মধ্যেই অবস্থা সামলান দায় হয়ে

উঠবে। সরকার এ ব্যাপারে সচেতন, ব্যবস্থাও নেওয়া হচ্ছে। ব্যবস্থা মানে ওদের ঝেঁটিয়ে বিদায় করা ছাড়া আর কি হতে পারে? বহুকাল হল বাসা বেঁধেছেন ওদেশে যেসব এশীয়রা বেনোজল ঢুকে তাঁদেরও না পরিষ্কার করে দেয়!

নিউহাউসের সঙ্গে কথা হচ্ছিল সংবাদপত্র সম্বন্ধে। সগর্বে বললাম আমি যে কাগজে কাজ করি, ভারতবর্ষে সর্বাধিক বিক্রিত সেটি। "কত কপি প্রতিদিন বিক্রি হয়?" "পাঁচ লক্ষ!" 'পশ্চিম বার্লিনে যে কাগজটি সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় তার সারকুলেশন জানেন কত? ৪.৫ মিলিয়ন কপি।" অর্থাৎ, পঁয়তাল্লিশ লক্ষ! আর ও প্রসঙ্গ কেউ ধরে রাখে? আর্টের কথা তুললাম। পরের দিন ব্যাবস্থা হয়েছে ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অব আরট দেখবার, ডিরেক্টরের সঙ্গে কথা বলা আছে, তিনি ভারতীয়টির জন্যে অপেক্ষা করবেন। পৌঁছলাম সময় মত। ডিরেক্টরের ঘরে সেক্রেটারী ভদ্রমহিলা বললেন, "বসুন, এক্ষুণি এসে পড়বেন সাহেব।" হন্তদন্ত হয়ে ডিরেক্টরের প্রবেশ, তাঁর কিছুটা দেরী হয়ে গেল বলে লজ্জা প্রকাশ করলেন। চায়ের অরডার হল! লক্ষ্য করলাম সাহেবের হাত-ঘড়িতে মিনিট আর ঘন্টার কাঁটার পরিবর্তে দুটি চতুষ্কোণ প্লাস্টিক টুকরো বসান; চতুষ্কোণের একটি কোণায় একটিতে লাল আর অন্যটিতে নীল ফোঁটা,—গোলাকার ঘড়ি, তার কোনও দাগ নেই কোথাও। তার মানে সময় জানতে হলে সবটাই হিসেবের ব্যাপার। কৌতূহলবশতঃ আমার প্রশ্ন, "কোথায় পাওয়া যাবে ঐ ঘড়ি?" কোথাও না, সাহেব তাঁর এক জানাশোনা কারিগর দিয়ে তৈরী করিয়ে নিয়েছেন। ডিরেক্টরের চশমাটিও কৌতূহলোদ্দীপক, মান্ধাতার আমলের সেই ছোট্ট ছোট্ট গোল গোল ফ্লাট কাচের কান পেঁচিয়ে ধরা চশমা। সাহেবের বয়স খুব জোর ৩৫ থেকে ৪০ এর মধ্যে। অ্যাকাডেমিতে আরট শেখাবার ব্যবস্থা আছে কি? না, ওখানে কিছু শেখান হয় না, নন টিচিং অ্যাকাডেমি। "আমার

এখানে অনেক প্রাচীন বস্তু দেখতে পাবেন। আমরা একটি সাময়িক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছি, দেখবেন?" "নিশ্চয়।" সেকালের জার্মান আসবাবপত্র, ঘর সাজাবার কায়দা, পর্দা, চিত্রকলা, ভাস্কর্য, কিউরিও ইত্যাদি নানান বস্তুর প্রদর্শনী। সাহেব বক্তৃতা করে চলেছেন, বস্তুটি কবেকার, কোথায় পাওয়া গেছে, কারা মালিক ছিলেন—হঠাৎ হো হো চিৎকার করে উঠলেন। চমকে গেলাম। না, কিছু না! টেলিফোন এসেছে, কথা সেরে সাহেব এক্ষুণি আসছেন। মিনিট দুয়ের মধ্যে আবার শুরু হল বক্তৃতা। লক্ষ্য করলাম সব ঘরের সিলিং আর থামের গায়ে প্লাস্টার করা হয় নি। "এ বাড়ির নির্মান কার্য কি সম্পূর্ণ হয়নি?" না, প্লাস্টার না করাটা ইচ্ছাকৃত, স্ট্রাকচারটা বোঝানো দরকার, তবেই না বাড়ি! যুক্তিটা মেনে নিলাম। আরও কিছুক্ষণ কাটল, জেরক্স প্রিন্ট করে কিছু কাগজপত্র ধরিয়ে দেওয়া হল আমার হাতে। নিউহাউসকে পাশে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম রাস্তায়।

জার্মানীর বিখ্যাত ডালেম মিউজিয়াম, ব্রুকে মিউজিয়াম, আর ন্যাশনাল মিউজিয়াম অব মডার্ণ আরট, এই তিনটি সংগ্রহশালা দেখে নিতে পারলেই হয়ে যায়, ছোট ছোট আরও অনেক কিছু আছে, সব মনের মধ্যে রাখতে হলে বেশ কয়েক মাস সময় লাগবে। আমার পিছনে ইন্টের নাশিওনের প্রচুর খরচ হচ্ছে, কয়েক মাস থাকা মানে আরও কয়েকগুণ বেশী খরচ, তা তো আর হতে পারে না। চটপট সেরে ফেলতে হবে। নিউহাউসকে জানালাম "প্রোগ্রাম ছোট করুন, সমকালীন আরট প্রদর্শনী, কার্টুনিস্টদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা, আরট শিক্ষায়তন, পরিদর্শন এসব বাদ যাক।"

ডিয়ে ব্রুকে আরট আন্দোলন হয়েছিল বার্লিনে যখন মিউনিখে চলেছে ব্লু রাইডারদের হৈ চৈ। বার্লিনের বাইরে ব্রুকেরা ছড়িয়ে পড়েনি। অবশ্য ব্রুকেদের গোড়াপত্তন হয় ড্রেসডেনে। দলের পাণ্ডা ছিলেন লুডউইগ কির্চনার। ব্রুকেরা ব্লু রাইডারদের মতই ফরাসী

এক্সপ্রেশনিসম-এর অনুগামী। পল গগ্যাঁ, ফান গঘ, এমিল ব্যারণার এঁদের অনুপ্রেরণা এবং পথ প্রদর্শক। ব্রুকেদের নিয়ে বার্লিন-বাসীরা বেশ গর্বিত। অতি আধুনিক একতলা এক মিউজিয়াম। যেমন আলোর ব্যবস্থা তেমনই সাজানর বাহাদুরী। স্বীকার করি ব্রুকে সম্বন্ধে জার্মানী যাবার আগে বেশী কিছু শুনিনি। ব্রুকে শব্দের অর্থটা কি? ব্রুকে মানে সাঁকো। ব্যাখ্যা—দর্শক আর শিল্পীর মনের যোগাযোগ ঐ সাঁকোর মাধ্যমে। সাদৃশ্য সত্যের দিকে নজর না দিয়ে রঙ বেরঙের পরীক্ষা নিরীক্ষা—বলা চলে অ্যাবসট্রাক্ট আর্ট-এর পূর্বাভাস। ব্রুকে মিউজিয়ামের ঠিক পিছনে মস্ত এক বাড়ি, বাড়িতে বাস করেন পশ্চিম বার্লিনের সবচেয়ে নাম করা সমকালীন ভাস্কর। হিটলারের রাজত্বেও ও বাড়ি ছিল শিল্পীদের আবাস, স্থান পেতেন ওখানে ফিউরারের অনুগ্রহভাজনরা। তখন অ্যাবসট্রাক্ট আরট করার শাস্তি, হয় দেশ থেকে বহিস্কার, না হয় কারাবাস, কিন্তু বর্তমানে যিনি দখল করেছেন ও বাড়ি তিনি বিমূর্ত কলার বিরাট ধ্বজাধারী। কালটা তো বদলে গেছে! ডালেম পৃথিবী বিখ্যাত মিউজিয়াম, পৃথিবী বিখ্যাত ছবি আর ভাস্কর্যের সংরক্ষণাগার। পারীর লুভর আরট গ্যালারীর মত ডালেমেও ত্রি-সীমানার মধ্যে মডার্ণ আর্টের প্রবেশ নিষেধ। ডালেমের বাড়ি ছিল এক বিচারাগার, সাবেকী স্থাপত্যকলার সুবৃহৎ অট্টালিকা। সোপান-সারির প্রথম ধাপে পা রেখেই অনুভব করা যায় ক্লাসিক কিছু দেখা যাবে। ভারতীয় আর্টের যারপরনাই সম্মান ডালেমে। বিরাট স্থান জুড়ে ভারতীয় আরট শোভা পায়। ভারতীয় সমকালীন শিল্পীরা অদ্যাবধি জাতে উঠতে পারেন নি ভারতভূমির বাইরে, কিন্তু প্রাচীন ভারতীয় চিত্রকলা ও ভাস্কর্যের অবিশ্বাস্য সম্মান!

সত্যিই রাগ হয় যখন দেখি আমাদের শহরের বড় বড় সংরক্ষণাগার গুলিতে মহামূল্য শিল্পকর্মের শোচনীয় অবস্থা। এসব সংরক্ষণাগারের তুলনা মালগুদামের সঙ্গেই হওয়া উচিত। এখানে না নেওয়া হয়

উপযুক্ত যত্ন, না আছে পারদর্শী রেস্টোরেশনের ব্যবস্থা, না মেনে চলা হয় প্রদর্শনের কোনও ফরমুলা। ডালেমে যে কালের আরট সেকালের আবহাওয়া সৃষ্টি হয়েছে অদ্ভুত কায়দায়, কি রোশনি, কি ঘরের গঠন, টেনে আনা হয়েছে হুবহু সেকালকে। ঘরের দেওয়ালে মুরাল। ভারত থেকে কেমন করে ঐ মুরাল তুলে নিয়ে যাওয়া হল তা রহস্য বটে। বৌদ্ধ আমলের ভারতীয় গুহার খণ্ড খণ্ড মুরাল ডালেমের ঘরে। মৃদু আলোয়, যেমন ভাবে দেখা গেছে ও ছবি গুহার মধ্যে এক সময় ঠিক তেমনই রূপের হয়েছে সৃষ্টি, ভারতীয় কলামহিমার যথার্থ পরিচয় বটে! পাথরের বুদ্ধমূর্তি, মিনিয়েচার চিত্রকলা, পিতল, তামা, বাহারে তৈজসপত্রাদি, ছোট ছোট ধাতব ভাস্কর্য—সব আছে ডালেমে।

ওলড মাস্টারদের মহল, রুবেন্স, রেমব্রানট, ডুরের, ক্রানাক, হলবীন, কাকে ছেড়ে কাকে দেখব। সমশক্তি প্রয়োগে সবাই টানছে। দাঁড়ালাম বত্তিচেলির সেবাসচিয়ানের সামনে। অসাধারণ রূপের অধিকারী পুরুষ, সারা অঙ্গে তীর বিদ্ধ, হাত দুটি এবং পা দুটিও মোড়স্বা করে এক বৃক্ষকাণ্ডে বাঁধা। যন্ত্রণার অভিব্যক্তি মুখে। ধন্য শিল্পী, এ ছবি দিচ্ছে তাঁর কলাজ্ঞানের সম্যক পরিচয়। অন্য ঘরে আরও এক সেবাশ্চিয়ান, একই ভাবে হাত-পা বাঁধা আর তীর বিদ্ধ, এঁকেছেন ফ্লেমিশ আরটিস্ট রুবেন্স। রুবেন্স আর বত্তি-চেলির অঙ্কন কৌশলে আসমান-জমীন ফারাক। মোলায়েম রঙের কাজ, রঁনেসাস শিল্পকলার প্রভাব স্পষ্ট, সুডৌল ফরমের উপস্থাপনা ভাবে ভরপুর। রুবেন্স ছিলেন বারোক আঙ্গিকের প্রবর্তক। দুই সেবাসচিয়ানের মধ্যে কোনটি বেশী রসোত্তীর্ণ তা বিচার করার সাধ্য আমার নেই, আমার ব্যক্তিগত অনুভূতির কথা বলতে পারি, বত্তিচেলির সেবাসচিয়ান আমার দৃষ্টিতে গরিয়ান। ট্রাডিশনে যে দেশে আইডিয়ালিসম, সেদেশের মানুষ তো ভাববাদী রচনারই ভক্ত হবে, বত্তিচেলির বিরাটত্ব উপেক্ষা করা এ ভারতীয়র

পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু রুবেন্স-এর আদম ও ইভ অসাধারণ সৃষ্টি, নারী যে কত সুন্দরী হতে পারে এবং পুরুষ যে কত রূপবান তার উপস্থাপনা ঐ আদম আর ইভ, পৃথিবীর প্রথম পুরুষ আর প্রথম নারী। শুধুই কি রুবেন্স আর বত্তিচেলি? রেমব্রাণ্ট নেই? রেমব্রাণ্ট কৃত প্রতিকৃতিগুলি তুলনাহীন সৃষ্টি। অনেক মাস্টারের অনেক ধর্মীয় রচনায় বিরাট মিউজিয়াম ভালেম, দু এক দিনের দেখার ব্যাপার নয়।

নিউহাউসের বেশী আগ্রহ আমাকে সমকালীন আর্ট দেখাবার, ন্যাশনাল মিউজিয়াম অব মডার্ণ আর্ট সম্বন্ধে ক'দিন ধরেই নানা কথা শোনাচ্ছেন তিনি। গৃহটি সমকালীন স্থাপত্যকলার এক উপ-ভোগ্য নিদর্শন। মনে হবে একতলা, কিন্তু আসলে দোতলা। কত ছবি আর কত যে ভাস্কর্যের আড়ৎ ঐ মিউজিয়াম তা অনুমান করা খুব কঠিন। চাতালে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কয়েকটি মডার্ণ ফর্ম, ভাস্করদের বিশ্বজোড়া খ্যাতি। সাদাসিধা দর্শকদের পক্ষে এঁদের কাজের রসগ্রহণ করা বড়ই মুস্কিল। বিরাট এক প্রস্তর কিউব, একটু বাঁকা ভাবে মেঝের ওপর এঁটে দেওয়া হয়েছে—কি অর্থ হতে পারে? শিল্পী নিজে হাতে ঐ কিউবটি কেটেছেন কিনা তাও সন্দেহের বিষয়। কোনওটিবা কোনও যন্ত্রপাতির অকেজো অবস্থা, রঙ করে যত্ন সহকারে উপস্থাপন করা হল ভাস্কর্য বলে। আবার কোনওটি বা তালগোল পাকান ধাতুর দলা।

মিউজিয়ামের ভিতর। ম্যাক্স আর্ণেস্টের মহিষরাজ, সিংহাসনে উপবিষ্ট, নিশ্চিত কৌতুহলোদ্দীপক। পাশের ঘরে পিকাবিয়া। সুররিয়ালিসম-এর প্রথম শিল্পী এই পিকাবিয়া। দাদাইস্টদের উত্ত-রাধিকারী সুররিয়ালিস্টরা। সুররিয়ালিস্ট আন্দোলন হয় অবশ্যই ফ্রান্সে। দাদাদের ঘাঁটি জুরিক শহরের কাবারে ভোলতের। জুরিক জার্মানীর সীমারেখা থেকে বেশী দূরে নয়, দাদাদের প্রভাব জার্মান-দের ওপরেও নেহাত কম পড়েনি। যুদ্ধের শেষে দাদা মন্ত্রে, অর্থাৎ

এ জগতের সব কিছুই মূল্যহীন এবং নিরর্থক, বহু জার্মান দীক্ষিত হন, সুতরাং সুররিয়ালিসম কোনও জার্মান আরট সংগ্রহে বিশেষ স্থান পাবে, আশ্চর্য হবার কিছু নেই। পাবলো পিকাসো অল্প কিছুকালের জন্যে সুররিয়ালিস্ট বলে পরিচিত ছিলেন, তাঁরও ঐ জাতের রচনা বার্লিনে দেখা যায়। মডার্ণ আরট মিউজিয়ামের বোধকরি সর্বাপেক্ষা মনোহারী যা তা হল ফরাসী ইমপ্রেসনিস্ট শিল্পী মানে, মোনে সিসলী, পিসারো আর ড্যাগার চিত্রকলা। অগস্ট রনোয়ারেরও ছবি আছে ঐ দলে। পারীর জো দ পম্‌-এ এঁদের ছবি সংরক্ষিত, কিন্তু বার্লিনের মডার্ণ আরট মিউজিয়ামে ঐ দিকপালদের কলা সম্ভারের নিঃসন্দেহে বেশী যত্ন এবং গুরুত্ব। রনোয়ারের একটি মস্ত ভাস্কর্য ওপেন এয়ারে বিবসনা নারী মূর্তি। ভাস্কর মাইয়োল এবং রণোয়ারের কাজে দারুণ সাদৃশ্য। ন্যাশন্যাল মিউজিয়ামে ইমপ্রেশনিস্ট থেকে শুরু করে একেবারে সাম্প্রতিক মিনিমাল আরট পর্যন্ত দেখা যাবে। ডিয়ে ব্রুকে আর ব্লু রাইডাররা বেশ খানিকটা স্থান দখল করে রেখেছে মিউজিয়ামের।

পত্রিকা বা পুস্তক মাধ্যমে এবং দূতাবাস পরিচালিত সংস্থা আয়োজনে যা সমকালীন জার্মান আরট অবলোকন করার সুযোগ হয়েছে, তাতে জার্মান বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট ভাবে কিছু ধরা পড়ে না, আন্তর্জাতিক 'র‍্যাট রেসেরই' জার্মান শিল্পীরা প্রতিযোগী।

সকালে হাঁটা চলা করছি, ইউরোপা সেন্টারের আশেপাশে, থমকে দাঁড়াতে হল—এক বিপনির সামনে; ফুটপাথের ওপর একটি সাইকেল রিক্সা হুবহু আমাদের দেশী কায়দায় তৈরী, তবে খুব চকচকে, পিছনে লেখা প্রথম নজরে পড়লাম লুফটহানসা। এ কি? নিউহাউস বিজ্ঞের মত জবাব দিলেন, ওটা লুফটহানসার বিজ্ঞাপন। কিন্তু লুফটহানসাতো নয়, লেখা আছে লুসটহানসা। তাইতো! তাহলে ব্যাপারটা কি হতে পারে? নিউহাউস আর কোনও উত্তর দেবার চেষ্টা না করে পা বাড়িয়ে দিলেন সামনের

দ্বিকে। বার্লিনে এখনও ঘোড়ায় চড়া পুলিশ দেখা যায়, যেমন এক সময় কলকাতায় অশ্বপৃষ্ঠে লালমুখো সার্জেন্টরা ঘোরা ফেরা করত।

সেক্সোরামায় খুব ভীড় হয় টুরিস্টদের। টিকিট কেটে চেয়ারে বসে সামনে স্টেজের ওপর দেখতে হবে নারীপুরুষের প্রাকৃতিক ক্রিয়াকলাপ। আমি বিবাহিত, অন্যের ব্যাপারে কোনও আগ্রহ নেই। নিউহাউস বললেন, "তবে আপনাকে এমন একটা জিনিস দেখাব যা জীবনে কখনও দেখেন নি, ভাবেনও নি।" মাল্টিভিজন। টিকিট কেটে নেওয়া হল, ঘণ্টা খানেক তখনও বাকি শো আরম্ভ হতে, এককাপ চা হলে ভালই হত। ইউরোপা সেন্টারের বাজারের ভিতরের রেস্তোরাঁয় চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছি, নজর গেল চারপাশের গাছগাছড়ার দিকে, লাল টকটকে ফুল, স্পর্শ করে বুঝলাম—প্লাস্টিকের। করুণা হয় বার্লিনবাসীদের প্রতি। রেস্তোরাঁর পাশে ঝরণা, সশব্দে অবিশ্রান্ত জল ঝরে চলেছে, কিন্তু সবই কৃত্রিম। মজা লাগছিল, একদিকে চলেছে নাচ গান, এদিকে সেদিকে জোড়ায় জোড়ায় যুবক যুবতী চুম্বনাবদ্ধ, অন্যদিকে দোকানীরা ব্যস্ত খরিদ্দার নিয়ে। সেটা শীতকাল নয়, শ্রীমতীরা চাইছেন নামমাত্র আবরণে পুরুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে। প্রত্যেকেরই বিশ্বাস যেন সবার চোখ তারই ওপর।

সময় হতে লাইন দিলাম মাল্টিভিজনের প্রেক্ষাগৃহের প্রবেশ পথে। ভিতরে সে কি ব্যাপার! কঁকর কোঁ কঁকর কো, মোরগ ডাক কান ঝালাপালা করে দেয় আর কি! তারপর গরুর হাম্বা হাম্বা রব, সেই সঙ্গে ক্যাঁচ কোঁচ কোঁ কাঁ জানা শব্দ, অর্থাৎ ঠেলাগাড়ি চলেছে। শব্দের সাহায্যে। ভিলেজ এফেক্ট, সিলিং-এ ইলেকট্রিক ডুমের মালা, মডার্ণ আলোক ব্যবস্থা ইচ্ছাকৃত ভাবে পরিত্যক্ত। শুরু হল সামনের পর্দায় শো, কতকটা সিনেমার মতই, আড়াআড়ি ভাবে মস্ত লম্বা স্ক্রীন, তিন ভাগে তিন রকম কাহিনী চলেছে, বিগত কালের

খবর, হিটলারের চেহারা ভেসে উঠল, আবার একেবারে সাম্প্রতিক কিছু ঘটনা—সব একাকার, স্ক্রীনের কোনখানটায় মন দেব? কি বুঝব? চোখ একবার এদিকে চায় একবার ওদিকে। শেষ পর্যন্ত মাথা ঠিক রেখে বেরিয়ে আসতে পেরেছিলাম সেইটেই ভাগ্যি। হাফ টাইমের সময় সারা পর্দা জুড়ে অসংখ্য বিজ্ঞাপন এক সঙ্গে। নজর পড়েছিল ঐ বিজ্ঞাপনের মধ্যে 'ক্যালকাটা কাফের' ওপর। নিউহাউসের উক্তি, "আপনাকে ঐ ক্যালকাটা কাফেতে নিয়ে যাইনি, ওদের খুব বদনাম, বাসী খাওয়ায়।" ক্যালকাটা কাফে বাসী খাওয়াচ্ছে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। বাস্তবিকই মাল্টিভিজন জীবনে কখনও দেখিনি।

সকাল ন'টা। যথারীতি নিউহাউস দৈনিক কাগজ পাঠ করছেন হোটেলের লাউঞ্জে। ব্রেকফাস্ট সেরে তাঁর সামনের সোফায় বসলাম। "আপনার বার্লিন দেখা আজই শেষ! চলুন শহরটা আরও একবার ঘুরিয়ে আনি আপনাকে, তারপর লাঞ্চ করে একেবারে পৌঁছাব এয়ারপোর্টে।"

ইউরোপের আধুনিকতম শহর পশ্চিম বার্লিন, কিন্তু ইতিহাস মুছে যেতে দেওয়া হয় নি। ঐতিহাসিক মূর্তি, ঐতিহাসিক স্থাপত্য, হয় মেরামত করে, না হয় নতুন করে উপস্থাপিত। সমকালীন চিন্তা থাক না কেন, রাজনীতির পরিবর্তন হোক না কেন, বিগত কালকে ওরা ভুলতে চায় না, ভুলবেও না কোন দিন।

বার্লিন থেকে মিউনিখ। মিউনিখে পৌঁছলাম বিকেল পাঁচটা, সাড়ে পাঁচটা নাগাদ। মেরে কেটে ঘণ্টা খানেকের ওড়া-পথ। একেবারেই ক্লান্ত হইনি। প্লেন থেকে নেমে বেশ তাজা চেহারায় চলেছি। সকলেই যেদিকে চলেছেন আমারও সেইদিকে পা চলেছে, সামনে এসে দাঁড়াল মুখোমুখি এক একহারা ছোকরা। খুব লম্বা। পরনে দামী পোশাক। মুখে হাসি নিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'মিস্টার মালিক?' 'ইয়েস।' আর প্রশ্ন নয়, একতাড়া কাগজপত্র আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে জানাল তার নাম আলেকজাণ্ডার ষ্ট্রিউফ। তারই উপর ভার পড়েছে আমাকে মিউনিখ শহর দেখাবার। 'চলুন আপনার লাগেজটা প্রথমে উদ্ধার করে নেওয়া যাক।'

লাগেজ বলতে একটা ঝোলা আর একটা লাল টুকটুকে ছোট্ট স্যুটকেশ। স্যুটকেশটা সহকর্মী নোটনের কাছ থেকে ধার করে ইউরোপ পাড়ি দিয়েছিলাম। ওটা যখন চওড়া ঘূর্ণি-ফিতের উপর অন্যদের বিরাট বিরাট আর দামী বাক্সপ্যাঁটরার সঙ্গে ঘুরপাক খেতে লাগল সঙ্গী তো হেসেই খুন। অত হাসির কী হয়েছে ?

'আমরা যেসব গেস্টদের অভ্যর্থনা করি তাঁদের একেক জনের সঙ্গে অন্তত তিন-চারটে করে বড় বড় বাগাজ থাকে, আর আপনি কিনা এসেছেন জার্মানী দেখতে এই একটা খেলাঘরের বাক্স নিয়ে !'

আমার কিছু বলার নেই ! স্যুটকেশটা তুলে নিয়ে আলেকজাণ্ডার ইঙ্গিত করল 'চলুন !'

ট্যাক্সি ডাকতে কলকাতার মতো ছুটোছুটি করতে হলো না, ঝগড়া ঝাঁটি দরকষাকষিও নয়, সামনে এসে দাঁড়াল এক প্রকাণ্ড বড় মারসেডিজ বেঞ্জ গাড়ি। ড্রাইভার বাইশ কি তেইশ বছরের একটি মেয়ে, বাঙালী হলে সুন্দরীর দলে পড়ত নিশ্চয়। বার্লিনেও মেয়েদের ট্যাক্সি চালাতে দেখে এসেছি, সুতরাং ব্যাপারটা নতুন ঠেকল না।

ট্যাক্সি চলছে, রাস্তার দিকে চেয়ে বসে আছি, মনে পড়ল এই মিউনিখেই তো অলিম্পিক হয়েছিল একবার। আলেকজাণ্ডার বলল, 'হ্যাঁ, মিউনিখ শহর তো খুব বড় নয়, অলিম্পিকের ক'দিন সারা পৃথিবী থেকে.প্রতিযোগী আর দর্শকের ভিড়, মোটর গাড়ির সংখ্যা কতগুণ বেড়েছিল কে জানে। খুব বেগ পেতে হয়েছিল আমাদের ব্যাপারটা সামলাতে।'

খবরের কাগজে পড়েছিলাম মিউনিখ অলিম্পিকে ইজরাইলী কুস্তিগীরদের আরব কমাণ্ডোদের হাতে নিধনের কথা। হতভাগ্যদের কদিন আটক রেখে তারপর মেশিনগান চালিয়ে মেরে ফেলা হয়। ঘটনাটা মনের মধ্যে ঘুরপাক খেতে লাগল।

দেখতে দেখতে কখন এসে পড়লাম হোটেল ইডেন উলফের সামনে। এই হোটেলেই আমাকে থাকতে হবে। কি জানি! হোটেলে কোন কমাণ্ডো বসে নেই তো লুকিয়ে? জয় মা বিপত্তারিণী! শুয়ে আছি তিন তলার ঘরে। দারুণ নরম বিছানা! ঘণ্টা খানেকের জন্যে আলেকজাণ্ডার বিদায় নিয়েছে, সে ফিরবে সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ। শুয়ে শুয়ে ভাবছি 'কোথায় ছিলাম, কোথায় এলাম, কোথায় যাব নাই ঠিকানা!'

সাতটা! ইডেন হোটেলেরই রেস্তোরাঁয় একটি ছোটখাটো টেবল বেছে নিয়ে বসলাম আমরা সামনা-সামনি। আলেকজাণ্ডারের বয়স কত হবে? নিশ্চয় বিশের বেশি নয়! আন্দাজে ভুল হয়েছে, তার বয়স তেইশ। আইনের ছাত্র সে। বাবা মা দুজনেই চাকুরিজীবী। অবস্থা বেশ ভালো। আলেকজাণ্ডার পরিষ্কার ইংরেজি বলে। ইংরেজি পালিশ করতে কিছুকাল সে লণ্ডনে কাটিয়ে এসেছে।

'কি খাবেন?'

'যা খাওয়াবে তাই-ই খাব।'

জার্মান খানার তো নাম জানি না কিছুই, দরকার কি ওস্তাদি মারার! জল পাওয়া যাবে না, ওয়াইন কিংবা বিয়ার কিছু একটা পানীয় না হলে খাবার গিলব কী করে? ওয়াইন এল। হোয়াইট ওয়াইন। তারপর সুপ। মেটেলির ছোট ছোট গোল্লার ঝোল, টলটলে জল, কাঁচা সবুজ পাতার খণ্ড ভাসমান। সুপ দেখা মাত্রই বললাম, 'এ সুপ আমি বার্লিনে খেয়েছি!'

'কেমন করে? এ সুপ তো ব্যাভেরিয়ান ডেলিকেসি!'

'হতে পারে। কিন্তু বার্লিনে ও সুপ নিউহাউস আমাকে রোজই খাইয়েছে।'

আলেকজাণ্ডার একটু যেন দমে গেল। আরও কিছু ডেলিকসি সামনে এল, সবই ব্যাভেরিয়ান ডেলিকেসিজ। সবচেয়ে তৃপ্তি দিল

শেষ আইসক্রীম; সবুজ, গোলাপী, হলুদ রঙের পানতুয়ার মাপে আইসক্রিম, পাত্র ভরতি। যেমন সে আইসক্রিমের বাহার তেমনই স্বাদু। ভোলা যায় না!

রাত্রে ভালো ঘুম হলো না, অত নরম শয্যায় কী ঘুম আসে? বরং মেঝেতে মাদুর পেতে শুলে আরামে ঘুমোতে পারতাম। সকালে আচ্ছা করে স্নান সেরে নিয়ে, নেমে গেলাম প্রাতরাশের উদ্দেশে। ডিম সিদ্ধ, চীজ, বানরুটি, পেষ্ট্রি আর চা। আরও বহু রকম খানা ছিল বটে কিন্তু অত আমার ধাতে সইবে না। পেটটা খুব ভরতি হয়ে গেছে, লাউঞ্জের সোফায় বসে একটি ইংরেজী খবরের কাগজের উপর চোখ বুলোচ্ছি, কানে এল 'সুপ্রভাত!'

আলেকজাণ্ডার এসে গেছে। সামনের ঘড়ির দিকে তাকালাম কাঁটায় কাঁটায় ন'টা। ঠিক ন'টার সময় তার আসবার কথা ছিল, ছোকরার সময় বোধের বাহাদুরী দিতে হয়!

গেলাম ইংলিশ গার্ডেনে। সবুজের সে কী বাহার। সবুজ গাছপালায় ঘেরা কয়েক একর জমি জুড়ে বাগান। সবুজের মধ্যে বৈচিত্র্য এনেছে ছিটে ফোঁটা লাল রঙ—দু-একটি নারী পুরুষের পোশাকে রয়েছে সেই রঙ। জোড়ায় জোড়ায় যুবক যুবতী প্রেমে বিভোর। সত্যিই প্রেম করার মতো জায়গা বটে ইংলিশ গার্ডেন। বাগানের আরও ভিতরে ঢুকে পড়লাম। সর্বনাশ। পঁচিশ-ত্রিশ কী আরও বেশি হবে—বস্ত্রহীন নরনারী। এরা স্বেচ্ছায় বস্ত্রহীন, বস্ত্রাভাবে নয়! ইংলিশ গার্ডেন দখল করেছে নিউডিস্টরা। কড়া রোদ্দুর উঠলে ওরা আর থাকতে পারে না, প্রকাশ্যেই সব আবরণ খুলে ফেলে। ব্যাপারটা বে-আইনি নিশ্চিত। বয়স্কদের ঘোরতর আপত্তি। কিন্তু পুলিশে দেখেও দেখে না, বিদেশী পর্যটকদের কাছে নিউডিস্টরা এক মস্ত আকর্ষণ যে! মহিলারা কিছুদিন আগে নাকি থাকতেন টপলেস হয়ে, এখন তারা টপ বটম দুইই লেস।

মিউনিখ প্রায়শই হয় বরফে না হয় কুয়াশায় ঢাকা। কিন্তু বরাত

ভালো, সেপ্টেম্বর মাসে আমি আকাশ বেশ পরিষ্কার দেখে এসেছি। সূর্যদেব তাঁর সোনার কিরণ ছড়িয়ে দিয়ে সারা শহর ঝলমল করে তুলেছেন। ইংলিশ গার্ডেনের পাতা ভরতি লম্বা লম্বা গাছের সারির ফাঁক পেরিয়ে রোদ্দুর এসে জমাট বেঁধেছে মখমল বিছনো জমিতে জায়গায় জায়গায়, আর তার উপর শুয়ে বসে দাঁড়িয়ে যেন কাঁচ কড়ার পুতুল, মডেল নয়, জীবন্ত স্ত্রী-পুরুষ, ন্যাংটা। একেবারে আদি যুগ নেমে এসেছে! শিকেয় উঠেছে সভ্যতা। আমি আর আলেকজাণ্ডার সভ্য জগতের মানুষ, একটু তফাতে দণ্ডায়মান।

পা চালাতে হলো, ওখানে বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকাটা নিরাপদ নয়, পোশাক পরা মানুষকে ওরা সহ্য করতে পারে না, হয়ত দল বেঁধে ছুটে এসে আমাদেরও কোট প্যান্টুল নেবে খুলে। আলেক-জাণ্ডারকে জিজ্ঞেস করলাম, 'নিউডিস্ট ক্লাবের সভ্য হবার নিয়মটা কী?'

'তেমন কিছু নিয়ম নেই, পোশাক খুলে ফেলে দলে ভিড়ে গেলেই হলো, কেউ আপত্তি করবে না।'

ব্যাভেরিয়ার রাজধানী মিউনিখ। মিউনিখ আর ব্যাভেরিয়া দুটোই ইংরেজী শব্দ। জার্মান ভাষায় মুনছেন আর বেয়ার্ন। ব্যাভেরিয়ানরা বড় অতিথি-বৎসল। ব্যাভেরিয়ানদের আতিথেয়তার সুখ্যাতি সেই ডিউক লুডউইগের সময় থেকে। বর্তমানে ব্যাভেরিয়া পশ্চিম জার্মানীর সর্ববৃহৎ রাজ্য। মন মাতানো চারপাশের প্রাকৃতিক শোভা। ঐ শোভার আকর্ষণেই রুশী শিল্পী কানডিনস্কী স্বদেশ ত্যাগ করে বাসা বেঁধেছিলেন এসে মুনছেনে। হ্রদ, জঙ্গল, নদী, পাহাড়ে ঘেরা মুনছেন আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে সাবেকী আমলের স্থাপত্যকলায়। মুনছেন এক ঐতিহাসিক নগর। এমন রোকোকার শহর আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। শুধু স্থাপত্যকলাতেই নয়, পেইন্টিং, ভাস্কর্য, প্লাস্টারের কারুকার্য, আলো, সব যেন বারোক আর্টের শেষ আভাটুকুও নিভিয়ে দিয়েছে। যেদিকে তাকাই, শুধু

আনন্দ আর আনন্দ। শোক দুঃখ তো সাময়িক, আনন্দই চিরস্থায়ী, তাই আনন্দ বিরাজমান তামাম আর্ট-এ।

আমার এ-প্রবন্ধ বিশেষজ্ঞদের জন্যে নয়, রোকোকো আর বারোক শব্দ দুটির কিছু ব্যাখ্যা দরকার মনে করি। রোকোকো হলো বাহার, এর পিছনে থাকে না কোনও ভাব কিংবা মতামত প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস। এ হলো শুধুই অলঙ্কার। স্থাপত্য শিল্পে, চিত্রশিল্পে, ভাস্কর্যে রোকোকোর আধিক্য ঘটে ইউরোপে আঠারো শতকে। তার আগে দাপট ছিল বারোকের। লিওনার্দো, রাফেল মিকেলাঞ্জেলো, তিজিয়ানো প্রমুখ মাস্টার শিল্পীদের রণেসাঁস আঙ্গিকের রবরবা স্তিমিত হয়ে এলে যে অতিরঞ্জন বা অনুরঞ্জন বাসা বাঁধল কলাবিদ্যার সব শাখায়—তারই নাম বারোক। বারোকের লক্ষণ প্রথম প্রকাশ প্রায় রণেসাঁস শিল্পী মিকেলাঞ্জেলোর রচনা-কৌশলে। রণেসাঁস নিয়মে মানব রূপটাই আর্টের সব হলো না, কিছুটা বাড়িয়ে না বললে, অতিরঞ্জন না করলে নাটক জমবে কেমন করে? মিকেলাঞ্জেলোর নাটক প্রভাবিত করল পরবর্তী যুগের রুবেন্স, রেমব্রান্ট, মুরিও, ফান ডাইক প্রমুখদের। কলাবিদদের কাছে এঁদের কলাকৌশল নাম পেল বারোক আর্ট। রোকোকো শিল্পীর বক্তব্য—ওসব ভাব, কাহিনী, চিন্তার কী মূল্য? ধার ধারি না! দৃষ্টি সুখকর অলঙ্কার সৃষ্টি করতে পারলেই কেল্লা ফতে।

রাস্তার দু পাশের বাড়িগুলোয় রোকোকোর যেন মেলা বসেছে, কী বাহার, কী বাহার! চোখ মেলে এগিয়ে চলেছি। এক জায়গায় থেমে আলেকজাণ্ডার অনুমতি চাইল সামনের ডাকঘরে ঢোকবার। ডাকঘরে আমার কোন প্রয়োজন ছিল না, আমি দাঁড়িয়ে রইলাম বাইরে। নাম করা শহর মিউনিখ যা দেখে ফ্রাঁসের প্রয়াত প্রেসিডেন্ট শার্ল দগল উচ্ছ্বাসে বলেছিলেন, 'ভোয়ালা উন কাপিতাল!' কিন্তু লোক কোথায়? সব ফাঁকা ফাঁকা! না, ভুল দেখেছি, একটু এপাশ

ওপাশ করতেই চোখে পড়ল বহুত মানুষ। জায়গাটা মারিয়েনপ্লাৎস এর এক কোণা। যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, পিছনে ফুল সাজিয়ে বসে আছে দোকানী। দু-একজন টুরিস্টের হাতে ক্যামেরা ক্লিক ক্লিক করে ছবি তুলে চলেছে, কিন্তু কি যে তুলছে তা ঈশ্বর জানেন! ধারে কাছে মোটর গাড়ি, বাস কিংবা ট্রাম তো দেখি না! পদচারীদের রাজত্ব। তামাশার অন্ত নেই, চলন পথের উপর রঙিন চকখড়ি দিয়ে কেউ ছবি আঁকছে, কেউ বা বিচিত্র পোশাকে ভাঁড় সেজেছে, দল বেঁধে মেয়ে-পুরুষ কোথাও বা শুয়ে বসে হাই তুলছে—কলকাতায় যেমন দেখা যায় ভিখমাংগাদের। ওরা কিন্তু ভিখারি নয়, বেশ অবস্থাপন্ন ঘরেরই ছেলেমেয়ে।

'একটু দেরি হয়ে গেল, খুব দুঃখিত।' আলেকজাণ্ডারের গলার শব্দে চমকে উঠলাম। কতক্ষণ সময় কেটেছে খেয়াল নেই। দুঃখ করার কিছু নেই, আমি বরং খুশীই হয়েছি, জায়গাটা উপভোগ করার সুযোগ পেয়েছি।

'চলুন, আল্টে-পিনাকোঠেক যাব।' বেশ কিছুটা হন্টন, তারপর ট্যাক্সি। দেখতে দেখতে আল্টে-পিনাকোঠেকের দোরগোড়ায়। আল্টে-পিনাকোঠেকের মানেটা কী? আলেকজাণ্ডার উচ্চারণ করছিল আল্টে-পিনাকুটিক। ঐটেই বোধহয় ঠিক উচ্চারণ। আল্টে মানে পুরাতন, পিনা মানে আর্ট, আর কোঠেক বা কুটিক, যাই হোক, মানে বাড়ি। আমাদের বাংলা শব্দ কুঠি আর কোঠেক একই। অর্থাৎ প্রাচীন আর্টের সংরক্ষণাগার। শব্দগুলো জার্মান মনে করলে ভুল হবে, ওগুলো গ্রীক। বেশ কয়েক জায়গায় চোট খাওয়া চেহারা আল্টে-পিনাকুটিকের বাইরেটা। প্লাসটার না করা ইটের দেয়াল। চোটগুলো বা ক্ষতগুলো হয়েছে বোমার ঘায়ে, গত বিশ্বযুদ্ধের সময়। পোড়া পোড়া দাগ। মার্কিন আর ব্রিটিশ হাওয়াই-হামলা থেকে জার্মানীর কোন শহরই বাদ পড়েনি, মিউনিখও না। অন্য সব চোট খাওয়া বাড়ি মিউনিখবাসীরা মেরামত করে নতুন করে নিয়েছে,

কোনো কোনটি আগাগোড়াই নতুন করে তৈরি হয়েছে। কিন্তু আল্টে-পিনাকুটিকের বাইরের দিকটা মেরামত করা হয়নি। যুদ্ধের পর যে চেহারা হয়েছিল তাদের ঠিক তেমনভাবেই তা রেখে দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের স্মারক আর কি! কিন্তু ভেতরে কোথাও ভাঙাচোরা নেই। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঘর, আর তেমনি সাজানো-গোছানো। সংরক্ষণাগার হিসেবেই বাড়িটি তৈরি হয়েছিল, পারীর লুভরের মতো রাজপ্রাসাদ থেকে আর্ট মিউজিয়ামে রূপান্তর করা হয়নি। অসাধারণ সমৃদ্ধ সংগ্রহ। মন ভরে দেখলাম ডুরের, হলবীন আর লুকাস ক্রানাকের চিত্রকলা। এঁরা সেকালের তিন জার্মান দিকপাল। ডুরের যে কত বড় শিল্পী তা তাঁর অরিজিনাল কাজ না দেখলে বোঝা অসম্ভব। এদেশে তো ডুরের সম্বন্ধে জ্ঞান শুধু তাঁর প্রিন্ট দেখে, তাও আবার কেতাবে। আল্টে-পিনাকুটিক পৃথিবীর প্রথম সারির সংরক্ষণাগারগুলির অন্যতম। বেয়ার্নের রাজা ডিউক উইলিয়াম (চতুর্থ) আল্টে-পিনাকুটিকের স্রষ্টা। সংগ্রহশালাটি তৈরি হতে শুরু হয় ১৫২৮ সালে, কবে যে শেষ হয়েছে তা বলতে পারব না।

সংগ্রহের তিনটি মূল ধারা বা দিক: ১. প্রাচীন জার্মান ছবি, যার মধ্যে পড়ছে ডুরের, হলবীন, ক্রানাক এবং আরও বহু শিল্পীর কাজ; ২. রুবেন্স-এর চিত্রকলা; ৩. ধর্মীয় আর্ট। রুবেন্স ফ্লেমিশ আর্টিস্ট হলেও তাঁর জনপ্রিয়তা ছিল ইউরোপজোড়া। দেশ-দেশান্তর থেকে ডাক আসত ছবি আঁকার অনুরোধ জানিয়ে। তাই সারা ইউরোপেই ছড়িয়ে আছে রুবেন্সের কলাকীর্তি। কিন্তু মিউনিখবাসীরা বলেন, 'রুবেন্স দেখতে চাও তো এস আমাদের এখানে।' কেমন করে রুবেন্সের অত ছবি আল্টে-পিনাকুটিকে এসে জমা হলো তা জানাবার সুযোগ হয়নি, শুধু দেখেই মুগ্ধ হয়েছি। শিল্পীর সর্ববৃহৎ ক্যানভাসটি,—'শেষ বিচার,' আছে আল্টে-পিনাকুটিকে। আবার রুবেন্সের ছোট ছোট ক্যানভাসও গুনে শেষ করা যায় না।

আলেকজাণ্ডার গর্ব করে বলল, 'পৃথিবীতে এত রুবেন্স একসঙ্গে আর কোথাও দেখতে পাবেন না।'

বিশ্বাস করিনি, পরে জানলাম কথাটা সত্যি। আন্টে-পিনাকুটিকের মতন অত ডুরের কাজ আর হলবীনেরও কাজ নেই আর কোথাও। কলকাতার দু-একটি সংগ্রহশালা দাবি করেন যে তাঁদের কাছেও অরিজিনাল রুবেন্স আছে। কিন্তু ইউরোপে রুবেন্স দেখে আসার পর সন্দেহ হয় কলকাতার ছবিগুলি সাচ্চা কিনা। এতকাল বিদেশীর কাছে গর্ব করে বলেছি 'শহর কলকাতাতেও রুবেন্স দেখতে পাবে।' আর কী তা বলতে পারব? প্যারীর লুভ্‌রে যা উল্লেখযোগ্য রুবেন্স আছে তা সবই মারী দ ম্যাদিসির স্তুতিগান, কমিশন করে আঁকান। আন্টে-পিনাকুটিকে রুবেন্স রচনা মূলত ধর্ম ভিত্তিক, তাহলেও রুবেন্স যে কী পরিমাণ শক্তিধর শিল্পী ছিলেন তার পরিচয় রয়েছে তাঁর প্রত্যেকটি কাজে। শোনা যায়, বড় ছবিগুলি রুবেন্সের একার আঁকা নয়, দু-তিনজন তাকে সাহায্য করেছে, শুধু রঙ তুলি হাতে ধরিয়ে দিয়েই নয়, কিছু কিছু এঁকে দিয়েও। শিষ্যরা ছিলেন অসামান্য পারদর্শী। পরে তাঁরাই আবার মাস্টার বলে স্বীকৃতি লাভ করেছেন। আরও অনেক ফ্লেমিশ দিকপাল শিল্পী, যথা ফান ডাইক, জরডীন্স, রেমব্রান্ট, প্রমুখদের চিত্রকলা শোভা পাচ্ছে, আন্টে-পিনাকুটিকে। বিরাট এক অংশ জুরে আছে ধর্মীয় ছবি। রণেসাঁস যুগের মাস্টারদের সবাইকার ছবি অবশ্যই নেই, তা হলেও রাফেল অভাব মুছে দিয়েছেন। তিনি একাই একশ। রাফেলের ম্যাডোনা মারী মাতার প্রতিকৃতি আর ওলন্দাজ শিল্পীদের আঁকা যীশু খ্রীস্টের মহিমা ঘরগুলোকে জমজমাট করে রেখেছে। কী যত্ন আর কী সংরক্ষণা! অতুলনীয় রেস্টোরেশন! পাঁচশ বছরের পুরাতন ছবির সামনে দাঁড়ালেও মনে হয় যেন এই মাত্র শিল্পী তাঁর তুলির শেষ টানটি ছুঁইয়ে সরে গেছেন।

আন্টে-পিনাকুটিকে সেরে, সামনের পার্ক পেরিয়ে পৌঁছলাম নিউ

পিনাকুটিকের সোপানে। উনবিংশ শতকের ছবি আর ভাস্কর্যের সংগ্রহশালা নিউ পিনাকুটিকের চেহারা ষোল আনা বিংশ শতকীয়। মারাত্মক আধুনিক স্থাপত্য কলাকৌশলে নির্মিত নিউ পিনাকুটিক। তখন বেশ বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে, ছুটতে ছুটতে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেলাম। আলেকজাণ্ডারের হুকুম, 'আগে লাঞ্চ সেরে নিতে হবে, তারপর যা খুশি করুন।' বেলা তখন প্রায় একটা, ছোকরার জোর খিদে পেয়ে গেছে।

নিউ পিনাকুটিকের একতলায় মস্ত রেস্তোরাঁ। রেস্তোরাঁর সামনে শান বাঁধান জলাশয়। ছাউনির নিচে বসেছি বটে কিন্তু বাইরের আবহাওয়া দিব্যি স্পর্শ করছে আমাদের, বৃষ্টির ছাঁট মেশা হাওয়া লাগছে গায়ে, উপভোগ করছি। সকালে যখন বেরিয়েছিলাম হোটেল থেকে তখন তেমন শীত ছিল না, কিন্তু এখন তাপমাত্রা বেশ কয়েক ডিগ্রী নেমে গেছে টের পাচ্ছি। খিচুড়ি, ইলিশমাছ ভাজা আর বেগুনির স্বপ্ন দেখতে লাগলাম। টেবলে এল জার্মান খানা। ওই খানাই খেতে হবে, উপায় কী?

প্রায় সাড়ে দশ কোটি জার্মান মুদ্রা লেগেছে নিউ পিনাকুটিক তৈরি করতে। প্রতিদিনই সরগরম হয়ে থাকে নিউ পিনাকুটিক। দলে দলে ছাত্র-ছাত্রী, দলে দলে পর্যটকরা, আর আর্টপ্রেমীরা ভিড় করে। এ বাড়ি কিন্তু নিউ পিনাকুটিকের মূল বাড়ি নয়। শত্রুপক্ষের কাছে আর্ট সংরক্ষণাগারের কোনও মূল্য ছিল না। মূল বাড়িটি যুদ্ধে বোমার ঘায়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। নিউ পিনাকুটিক নতুন করে গড়ে তুলতে হবে, ঘোষণা হলো প্রতিযোগিতার। ডাক লাগার নকশা চাই! প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করলেন আলেকজাণ্ডার ফন ব্রাঙ্কার। বোঝা যাচ্ছে বিচারকদের মধ্যে দলে ভারী ছিলেন আধুনিকপন্থীরা। যখন বাড়িটি তৈরি হলো, সমালোচনার বন্যা বয়ে গেল সারা শহরে। সংবাদপত্রের ক্রিটিক বললেন, 'রটেন-বুর্গ আর হলিউডের এ যেন জগাখিচুড়ি!' কিন্তু যতই হোক, যিনি

পারীর সমকালীন আর্ট গ্যালারী পঁপিদু সেণ্টার দেখেছেন তাঁর চোখে পিনাকুটিক আধুনিকতায় অবশ্যই পিছিয়ে আছে। নিউ পিনাকুটিকে ইট সিমেণ্ট পাথর ইত্যাদি সৌধ নির্মাণের সব মাল-মশলাই ব্যবহার হয়েছে কিন্তু পঁপিদু সেণ্টারে লোহা-লক্কড় এবং কাচ ছাড়া আর কিছুই নেই। মনে হয় যেন কোনও কল-কারখানা। হবেই তো! ভুলে যাবেন না, পঁপিদু সেণ্টার বিংশ শতকের আর্ট আভাঁ গার্দের সংগ্রহশালা।

নিউ পিনাকুটিকে কাচের ছাদ থেকে প্রকৃতির আলো আর ভেতরের কৃত্রিম বিজলীবাতি মিলে সৃষ্টি হয় এক অদ্ভুত এফেক্ট, ছবি এবং ভাস্কর্যের মহিমা বেড়ে হয় দ্বিগুণ। গোয়াইয়া আর গেনসবোরো থেকে যাত্রা হল শুরু। গোয়াইয়া স্পেনের মাস্টার, গেনসবোরো ইংলণ্ডের। সেখান থেকে রোমাণ্টিক ল্যাণ্ডস্কেপের ঘরে। তারপর জার্মান ক্লাসিস্ট ছবি। নিউ পিনাকুটিকেও ধর্মীয় ছবি আছে, তা অবশ্য আল্টে-পিনাকুটিকের সংগ্রহের তুলনায় মূল্যের দিক থেকে ততটা নয়। নিউ পিনাকুটিকের যা সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য তা হল ইমপ্রেসনিস্ট ছবি—দেগা, সেজান, গগ্যাঁ, মানে, মোনে এবং ফান গঘের রচনা সম্ভার। উল্লেখ্য গগ্যাঁ এবং ফান গঘের কলাকৌশল মিউনিখের ব্লু রাইডারদের অনুপ্রেরণা। ওই অনুপ্রেরণারই ফল জার্মান এক্সপ্রেসনিসম যার কর্ণধার কানডিনস্কী, ফ্রানৎস মার্ক এবং পল ক্লী। সব শেষ আর্ট নুভো আর সিমবলিসম দেখে বেরিয়ে আসতে হবে সংরক্ষণাগার থেকে। যদিও জার্মান ছবিই বেশি, জার্মান শহরের আর্ট মিউজিয়ামে বেশি জার্মান ছবি থাকাটাই সমীচীন, তা হলেও ফরাসী আর ইংলিশ ছবির সংখ্যা নেহাত কম নয়। ফরাসী ছবির মধ্যে ইমপ্রেসনিস্ট তো বটেই, আছে রোমাণ্টিক মাস্টার জেরিকো, কোরো এবং আরও অনেকের কাজ।

আলেকজাণ্ডারকে বললাম, 'এবার কিছুটা হাঁটব, সব সময় গাড়ি চড়ে ঘুরতে ভালো লাগছে না, গাড়ি চড়াটা আমার ধাতে সয় না।'

পথ দিয়ে পয়দল চলেছি আর এদিক ওদিক তাকাচ্ছি, বড় বড় ভাস্কর্য একেকটা বেদী বাদ দিলে বার ফিট, পনের ফিটের নিচে নয়। নারী ও পুরুষ মূর্তি। আমার ধারণা, পুরুষ মূর্তিই সংখ্যায় বেশি। ভাস্কর্যে বিবসনা নারী আমাদের চোখে সয়ে গেছে; সেকালের ভারতীয় শিল্পী কি নিখুঁত মূর্তিই না গড়ে রেখে গেছেন! কিন্তু বস্ত্রহীন পুরুষ মূর্তি, বিশেষ করে তাকে যখন সামনে ফিরিয়ে উপস্থাপিত করা হয়, কিঞ্চিৎ অস্বস্তির কারণ হয়ে পড়ে। মিউনিখে রাস্তার মোড়ে কিংবা কোনো গেটের দুপাশে কিংবা কোনো পার্কে অহরহই চোখে পড়বে দণ্ডায়মান পুরুষ নিউড—নিঃসন্দেহে গ্রেকো রোমান ক্লাসিক আর্টের পুনরাবৃত্তি। ইংলিশ গার্ডেনের নিউডিসম বোধ করি ওই সব ক্লাসিকেরই প্রভাব। আবার এও হতে পারে, শীতের দেশ জার্মানী, সব সময় মোটা আর ভারী উলের জামা প্যান্টুলুন চাপিয়ে চলতে ফিরতে হয়, এমন কি হাতের আঙুলও দস্তানার মধ্যে গুঁজে না রাখলে কাজ করার ক্ষমতা লোপ পাবে। তাই একটু গরম পড়লেই, রোদ্দুর উঠলে তো আর কথাই নেই, সব খুলে ফেলে ওরা হাওয়া লাগায় গায়ে। হাওয়া বাতাস না লাগলে গা যে ফুসকুড়িতে ভরে যাবে। আমরা সাহেবদের নকল করি। সাহেব মেমেরা উলঙ্গ হয়ে সমুদ্রের ধারে, কিংবা বাগিচার ঘাসের ওপর শুয়ে বসে আছে দেখে যদি এ গরম দেশের মত ছেলেমেয়েরাও বটানিক্যাল গার্ডেন কিংবা ইডেন গার্ডেন কিংবা দীঘার বালিয়াড়ির ওপর রৌদ্রস্নানে রত হয় তাহলে ব্যাপারটা যুক্তিসঙ্গত হবে কী? কেলেঙ্কারী হবে। যেভাবে পাশ্চাত্য প্রভাবের জালে জড়িয়ে পড়েছি আমরা, মনে হচ্ছে আর দেরী নেই, নিউডিসম এল বলে। শুনেছি ভারতের কোনো কোনো অংশে ইতিমধ্যেই ফ্যাশনেবলরা নিউডিস্ট হয়ে পড়েছেন।

সন্ধ্যাবেলাটা সিনেমা কিংবা অপেরা কিংবা থিয়েটারে কাটে ভালো। সিনেমা থিয়েটারের ওপর তেমন কৌতূহল নেই, আমার

অপেরা সম্বন্ধে জানবার ইচ্ছে ছিল। মিউনিখের অপেরা হাউস খুব নামকরা। রোমান স্থাপত্যকলায়, উঁচু উঁচু থাম নিয়ে মস্ত বাড়ি, দারুণ বাহার! ভেতরের বাহার তার থেকেও বেশি—যেন রোকোকোর উৎসব। সামনের দ্বিতীয় সারির আসনে বসলাম। জার্মান ভাষায় একমাত্র 'গোটেন মরগ্যান' ছাড়া আর কিছুই রপ্ত হয়নি, তবে অসুবিধে হবে না, পাশে আলেকজাণ্ডার আছে, নাটকটা সে তর্জমা করে বুঝিয়ে দেবে আমাকে।

অপেরা বলতে আমার জ্ঞান কলকাতার চিৎপুর পর্যন্ত। ওই রকমই কিছু দেখব আশা করে বসেছিলাম, কিন্তু যখন আরম্ভ হলো, বুঝলাম জাতটা ভিন্ন। প্রথম দৃশ্য সমুদ্রতট, দুটি যুবতী স্নানান্তে ক্রীড়ারত। তাদের অঙ্গে নেই তিলমাত্রও আবরণ। আড়াল থেকে দুই যুবক যুবতী-রূপসুধা পানরত। তারপর, গল্পে যেমন হয়ে থাকে, যুবক দুটির লালসা পরিণত হলো গভীর প্রেমে। তাদের সাদি হবে; কিন্তু হুকুম এলো রাজার কাছ থেকে, যুদ্ধ বেঁধেছে, প্রত্যেক যুবককে নাম লেখাতে হবে সৈন্যদলে। আপাতত সাদির কথা আর নয়, যুদ্ধ থামুক। বছর ঘুরে গেলো, বুঝি প্রেমিকরা ফিরবে না কোনও দিন। কতকাল আর রইবে বসে প্রেমিকারা? শহরে এল দুই আরব বেদুইন। নজর তাদের সুন্দরীদের ওপর। বেদুইনদের চেষ্টার অন্ত নেই, জয় করতেই হবে সুন্দরীদের মন। একটি মেয়ে সহজেই রাজি হয়ে গেল, অন্যটি কিন্তু শক্ত, তার প্রেমিক ফিরে আসবেই। আসলে ওই বেদুইনরা আর কেউই নয়, ছদ্মবেশে এসেছে প্রেমিকদ্বয়, প্রেয়সীরা সাচ্চা কিনা যাচাই করতে। যা হোক, নাটকের সমাপ্তি ঘটল মিলনান্তে। অপেরায় সব কথোপকথন হয় সঙ্গীতে, সঙ্গে বাজনা বাজে অবিরত। পর্দা পড়ে যাবার পর মুহুর্মুহু হাততালি। হাত ধরাধরি করে সার হয়ে অভিনেতা-অভিনেত্রীরা পর্দার সামনে দর্শকদের অভিনন্দন গ্রহণ করে বার বার তিন-চারবার করে বাইরে এসে। অপেরায় গিয়েও হলো নিউড দর্শন।

আমি কলকাতার বাসিন্দা ; আলেকজাণ্ডার শুনেছে কলকাতার লোকেরা ভাত খেতে ভালোবাসে। চীনা রেস্তোরাঁয় ভাত মিলবে। ঘুরপাক খেতে খেতে পৌঁছলাম শহরের সবচেয়ে নামকরা চীনা রেস্তোরাঁটিতে। রাত্রি প্রায় তখন এগারোটা। সামনে ম্যাণ্ডারীন ভাষায় লেখা সাইনবোর্ড। ম্যাণ্ডারীন জানি না সুতরাং পড়তে পারলাম না রেস্তোরাঁর নামটা। ভেতরে বাহারে কাগজের ল্যাম্পশেড, পেয়ঁজু কিংবা চি পাই সিরের ছবির মতো স্ক্রোল আর সেরামিক্স—অলঙ্করণের কোনো ত্রুটি নেই, কিন্তু চীনারা কোথায় ? একটি চীনাকেও দেখতে পাচ্ছি না। জার্মান বয় খানার অর্ডার নিয়ে গেল। কিন্তু কোথায় সেই ফ্রাইড রাইস, কলকাতায় চুংওয়াঃ কিংবা পিপিং রেস্তোরাঁয় আমরা প্রায়শই যার স্বাদ গ্রহণ করে থাকি ? দলা পাকানো সাদা ভাত, রসাল পর্ক কারী আর আনুষঙ্গিক—সালাদ ইত্যাদি; যাই হোক, চাল সিদ্ধ ভাত তো বটে, বেশ তৃপ্তি করেই উদরস্থ করলাম। একটু নিচু গলায় আলেকজাণ্ডারকে জিজ্ঞেস করলাম, "চীনারা কোথায় ?"

আলেকজাণ্ডার বিব্রত বোধ করল। প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে দিয়ে সে অপেরার কথা পাড়ল। অপেরা কেমন লাগলো আমার ? খুব ভালো। তবে পাশ্চাত্ত্য ক্লাসিক্যাল সুরে আমার শ্রবেণন্দ্রিয় যে ধাতস্থ হয়নি সে কথা চেপে গেলাম। অপেরা ব্যাপারটা শুধুই আর্ট, পিছনে নেই কোনো উদ্দেশ্য।

পরের দিন সকালে, রোজ যেমন থাকি, সেদিনও স্নান আর ব্রেকফাস্ট সেরে বসে আছি হোটেলের লাউঞ্জে আলেকজাণ্ডারের অপেক্ষায়। হোটেল থেকে এক পা একা এগোবার উপায় নেই। প্রথমত কোনো রাস্তাঘাট চিনি না, দ্বিতীয়ত পকেটে যা ডি এম আছে তাতে খুব জোর এসপ্লানেড থেকে ভবানীপুর পর্যন্ত দূরত্ব ট্যাক্সিতে যাওয়া যেতে পারে। ফেরার ভাড়া আর থাকবে না। সুতরাং আলেকজাণ্ডারের পথ চেয়ে বসে থাকা ছাড়া কোন গতি নেই।

নটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে ছোকরার মুখ দেখতে পেলাম কাচের পার্টিশানের ওপাশে। আর অপেক্ষা নয়, বেরিয়ে পড়লাম। ব্লু রাইডারদের ছবি দেখতে যাব।

ব্লু রাইডার দলের মধ্যমণি ছিলেন কানডিনস্কী। গোষ্ঠী গড়ার বুদ্ধিটা ফ্রানৎস মার্কের; আর পল ক্লী দলের এক সাংঘাতিক শক্তি। কানডিনস্কীর জন্মভূমি মস্কো। ছবি আঁকার নেশা ছেলেবেলা থেকেই, কিন্তু কানডিনস্কী ইউনিভারসিটিতে নাম লিখিয়েছিলেন আইনের ক্লাসে। মস্ত আইনজ্ঞ হবেন এইটেই ছিল ইচ্ছে। ঘটনাচক্রে শিল্পীদের সংস্পর্শে এলেন এবং শেষে ছবি আঁকাই হয়ে দাঁড়াল সব সময়কার ধ্যান ধারণা। বাসা বাঁধলেন এসে মিউনিখে। মিউনিখের আবহাওয়া আর চারপাশের নৈসর্গিক দৃশ্য তাঁকে বশ করে ফেলল। মাঠে-ঘাটে ঘোরেন, ল্যাণ্ডস্কেপ আঁকেন, কিন্তু মস্কোয় যাঁর জন্ম তিনি সঙ্গীতের প্রভাব এড়াবেন কী করে? যা আঁকেন সবই যে জড়িয়ে পরে সুরের জালে। রিপ্রেজেণ্টশনাল ল্যাণ্ডস্কেপ ঠিক হয় না, অতিরঞ্জন বাসা বাঁধে। পল গগ্যাঁ, ফান গঘ—এঁদেরও তো রচনায় সাদৃশ্য সত্যটা মুখ্য নয়। কানডিনস্কী মনে মনে গগ্যাঁ, গঘকে গুরু বলে মেনে নিলেন আর দেখতে দেখতে গঘের বেপরোয়া টানটোন এবং গগ্যাঁর বর্ণ সংশ্লেষণের সমন্বয় ঘটল কানডিনস্কীর রচনায়। রিপ্রেজেণ্টশন হটতে থাকল ক্রমশই দূরে। শেষ পর্যন্ত দাঁড়াল রঙটাই সব, সাদৃশ্য কিছু নয়। ফ্রানৎস মার্কেরও নজর গগ্যাঁ-গঘের ছবির দিকে। রচনায় তার তাল তাল ঠাণ্ডা রঙের আসঞ্জন চলেছে, গাছের রং সবুজ, তো লাগিয়ে দাও বেশ খানিকটা সবুজ, আকাশ নীল তো লাগাও নীল। অবিকল গাছের মতো দেখতে হলো কিনা, আকাশের চেহারা ফুটল কিনা কিছু ভাববার দরকার নেই, রঙটাই হলো আসল। অশ্বের গায়ের বর্ণ হরিৎ করলেই বা হবে না কেন? বেসুর না বাজে, দর্শনেন্দ্রিয় পীড়িত না হয়, সেইটেই শুধু লক্ষ্য রাখবার। নীল আর সবুজের ঘনঘটা! নীল ঘোড়ার সওয়ার

মার্কের ইচ্ছায় গড়ে উঠল তরুণদের দল ব্লু রাইটার বা ব্লু রাইডার। প্রথাগত ধারায় ছবি বা ভাস্কর্য সৃষ্টি সমকালীন বোদ্ধাদের বাহবা পায় না, তা সে কাজ যতই নিখুঁত আর রসোত্তীর্ণ হোক না কেন! শিল্পীরা তাই চেনা পথ ছেড়ে চলেছেন নতুন কিছুর সন্ধানে। মার্কের সঙ্গে আছেন অভিযাত্রী কানডিনস্কী, পল ক্লী, গাবরিয়েল মুণ্টের, আরও অনেকে। বার্লিনের তরুণবাও তখন নতুনের অভিযানে এগিয়ে চলেছেন টগবগিয়ে, ফরাসী আধুনিকদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। বার্লিনের ব্রুকেরা আর মিউনিখের ব্লু রাইডাররা বুঝি ফরাসী বিপ্লবীদের দেয় হারিয়ে! পল ক্লী, কানডিনস্কীর মতো, জার্মান নন, সুইৎসারল্যাণ্ডের অধিবাসী। গাবরিয়েল মুণ্টের সম্বন্ধে এদেশে আমরা খুব কম শুনেছি। কানডিনস্কীর ঘনিষ্ঠতমা বান্ধবী এই গাবী ছিলেন দারুণ প্রতিভাময়ী। ব্লু রাইডার শিল্প আন্দোলনে গাবরিয়েলের অবদান অনস্বীকার্য। একই ঘরে বাস, এক ঘরে ওঠা বসা, এক ঘরে ছবি আঁকা—সুতরাং প্রভাব তো কিছুটা পড়বেই, আর কানডিনস্কীর মতো ব্যক্তিত্ব যেখানে! গাবরিয়েল ছবি আঁকলেন কানডিনস্কীর ধারায়। কিন্তু স্বকীয় অনুভূতি প্রকাশ পেল তাঁর দেখা আর দেখানর মধ্যে। এ দলের আরও এক অনস্বীকার্য শিল্পী জওলেনস্কী। নাম শুনেই বোঝা যায় ইনিও বিদেশী। ব্লু রাইডারদের রচনামালা সংরক্ষিত হয়েছে লেন ব্যাক হাউস-এ। রাজার মতো ধনী শিল্পরসিক লেন ব্যাক বাড়িটি উৎসর্গ করেন শিল্পীদের নামে। বেশ পুরনো বাড়ি, ফ্লোরেণ্টাইন আর্কিটেকচারে নির্মিত। মিউনিখে থাকা কালে আঁকা কানডিনস্কী তাঁর সব ছবির উত্তরাধিকারী করেন গাবীকে। লক্ষ লক্ষ মার্কের অধিকারী হতে পারতেন গাবরিয়েল কানডিনস্কীর ছবি বেচে। কিন্তু না, তার অর্থের প্রয়োজন ছিল না, গাবরিয়েল ওই বিরাট সম্পত্তি তুলে দেন সরকারের জিম্মায়। শোনা যায়, শিল্পী হিসেবে ইউরোপে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথম সমাদৃত হন ব্লু রাইডারদের কাছেই। ব্লু রাইডার আর ব্রুকে, আর্ট এক্সপার্টরা

বলেন, এঁরা দু দলই আসলে ফরাসী ইমপ্রেশনিসমের উত্তরসূরী এক্সপ্রেসনিস্টস।

কানডিনস্কীকে ধরা হয় বিমূর্ত আর্টের প্রথম পুরুষ বলে। কিন্তু মিউনিখে যা ছবি দেখলাম কানডিনস্কীর তা আদৌ বিমূর্ত আর্ট বলা যাবে না। প্রকৃতির কোনো বস্তুর সঙ্গে সম্পর্ক না রেখে যখন শিল্পী কিছু কাল্পনিক ফর্ম সৃষ্টি করেন এবং ফর্মগুলি পরস্পর মিলে সুখকর ভাবের অবতারণা করে, তাকেই বলা হবে অ্যাবষ্ট্রাক্ট আর্ট। রঙের ভূমিকা অ্যাবসট্রাক্ট আর্টে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কানডিনস্কীর মিউনিখ রচনাবলীর উৎস সব সময়েই প্রকৃতি। সব কাহিনীই প্রকৃতিভিত্তিক। প্রকৃতির সঙ্গে তালাক ঘটেছিল শিল্পীর যখন তিনি মিউনিখ ছেড়ে পারীতে বাসা বদলেছেন। পারীর ববুর আর্ট গ্যালারীতে কানডিনস্কীর অ্যাবসট্রাক্ট আর্ট দেখারও সুযোগ হয়েছে আমার, কিন্তু তুলনা করলে মনে হয় মিউনিখের কানডিনস্কী যেন বেশি উপভোগ্য, বেশি সুবেদী।

প্রচণ্ড বৃষ্টি পড়ছে, সঙ্গে তেমনি শীত, বেশ বুঝিয়ে দিচ্ছে আল্পস পাহাড় খুব কাছাকাছি। সেদিন যাবার কথা রলফ লিজের কাছে। রলফ লিজে মিউনিখের ফাইন আর্টিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেণ্ট। ধারণা ছিল মস্ত ষ্টুডিও দেখব, মিউনিখ শহরের সুকুমার কলাকুশলী সংঘের সভাপতি হোমরা-চোমরা কেউ হওয়াই স্বাভাবিক; তাঁর ষ্টুডিও হবে হাল ফ্যাশনের, ব্যবস্থা দেখে মাথা যাবে ঘুরে। কিন্তু লিজের ষ্টুডিও হাল ফ্যাসানের আদৌ নয়, এক পাশে তাকের ওপর ঢিবি হয়ে ছবি রয়েছে জমা, দু-তিনটি এধার-ওধার টাঙানো। সামনে ইজেলে অর্ধ সমাপ্ত একটি। দুটি কুর্শী আর গোটা দুয়েক টুল। পাশে উঁচু টেবলে টেলিফোন। খুব সামান্য জায়গা নড়া-চড়ার জন্য ছেড়ে রাখা। এক কোণায় কফি তৈরির ব্যবস্থা। আমাদের দেখেই রলফ ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। প্রথমত আমি বিদেশী, দ্বিতীয়ত ক্রিটিক। ক্রিটিকদের সব দেশের শিল্পীরাই একটু বেশি খাতির

করেন। কারণ শিল্পীদের নামকরার ব্যাপারটা একালে নির্ভর করে ক্রিটিকদের অনুগ্রহের ওপরই।

'কফি খাবেন?'

'মন্দ হতো না।'

নিজেই কফি তৈরি করতে লেগে গেলেন আর্টিস্ট, তাঁর কোনো অ্যাসিস্টাণ্ট নেই। অতি সুপুরুষ এক যুবক রলফ লিজে। গোঁফ দাড়ি কামানো। মাথা ভরতি বাদামী ঢেউ খেলান চুল। ভালো ইংরেজী বলতে পারেন না। রলফ বলবে জার্মান ভাষায়, তা তর্জমা করবে আলেকজাণ্ডার ইংরেজিতে। কথা চলতে চলতে দেখি দিব্যি ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে রলফ তাঁর বক্তব্য রাখতে শুরু করে দিয়েছেন। কেবল প্রেজেণ্ট টেন্স, পাস্ট টেন্সে আর জেণ্ডারে গোলমাল। তা হোক, আমার বুঝতে কিছুমাত্রও অসুবিধে হচ্ছে না। আলোচনা জমে উঠল। ভারতে সমকালীন শিল্পীরা কী ভাবছে, কী করছে? দারুণ কৌতূহল রলফের। তন্ত্র আর্ট ব্যাপারটা আসলে কি? কালীঘাটের পট এখনও দেখা যায়?—নানা প্রশ্ন। রলফ প্রস্তাব করে বসলেন, মিউনিখে ভারতীয় আর্টের প্রদর্শনী হোক। সরকারী সংস্থার মাধ্যমে নয়, ব্যবস্থা করবে বেসরকারী মিউনিখ আর্টিস্টস অ্যাসোসিয়েশন। আর ভারত থেকে ছবি পাঠাবার দায়িত্ব নিতে হবে আমাকে। একজিবিশন হবে মিউনিখ অ্যাকাডেমিতে। হলটা একবার দেখে আসা দরকার আমার।

টেলিফোন তুলে রলফ জানিয়ে দিলেন অ্যাকাডেমিকে, ভারতীয় ক্রিটিককে ভালো করে একজিবিশন হলটি যেন দেখিয়ে দেওয়া হয়। ষ্টুডিও থেকে বেরিয়ে এসে বড় রাস্তার মোড়ে আমাদের ট্যাক্সি ধরিয়ে দিয়ে তবে রলফ বিদায় নিলেন। যেন সব ব্যবস্থাই হয়ে গেল। তিনি তো জানেন না এদেশের ব্যাপারে কত বাধা, কত বিপত্তি!

মিউনিখ অ্যাকাডেমির দোরগোড়ায় পৌছানর সঙ্গে সঙ্গেই সাদর

সন্তরষণ। সেক্রেটারি ভদ্রমহিলা রলফের টেলিফোন পেয়ে আমাদের জন্যেই অপেক্ষা করছিলেন। একটা প্রদর্শনী চলছিল। সমকালীন আর্টের প্রদর্শনী। সমকালীন জার্মান আর্ট বার্লিনে কিছু দেখে এসেছি, মিউনিখের শিল্পীদের কাজে খুব একটা পার্থক্য লক্ষ্য করলাম না। শহর কেন, কোন দেশেরই সমকালীন আর্টে নেই প্রভেদ, যেমন পার্থক্য দেখা যায় না একালের ছেলেমেয়েদের পোশাক পরিচ্ছদে সারা দুনিয়ায়।

অ্যাডিলেডে বিশ্ব আর্ট কংগ্রেসে স্লোগান শুনেছিলাম 'দুনিয়ার আর্ট এক হোক!' বোধ হয় তারা এইটেই বলতে চেয়েছিল। এলোমেলো টানটোন, কখনও বা কিছু ফিগার, কখনও শুধুই রঙের প্রলেপন। ছবি আঁকার প্রচলিত ব্যাকরণের দফা রফা। যা হোক আমি প্রদর্শনীর সমালোচনা করতে বসিনি, কী দেখেছি শুধু তারই বর্ণনা দেবার কথা। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কাগজে মোটা মোটা আঁচড়ে আঁকা হয়েছে কয়েকটি বিশ্রামরত পুরুষ নিউড। ক্যাপশন—ইংলিশ গার্ডেন। লিজের কথা, "ভালো করে দেখে নেবেন অ্যাকাডেমির ও হল ভারতীয় চিত্রকলা প্রদর্শনীর উপযুক্ত কিনা"

খুব উপযুক্ত! অমন আলোর ব্যবস্থা আর প্রশস্ত কক্ষ কোথায় পাব আমরা? তবে যা ছবি দেখলাম চলতি প্রদর্শনীতে তা যেন আমাকে ধাক্কা দিয়ে ঠেলে বার করে দিল সেখান থেকে। সমকালীন আর্ট যে কোথায় গিয়ে থামবে কে জানে!

আরও একটি সমকালীন আর্টের প্রদর্শনী। কত যে ছবি আর ভাস্কর্য গুণে শেষ করা যায় না। বিনা পয়সায় প্রবেশ করা চলল না, ভারতীয় আর্ট ক্রিটিক তো কী হয়েছে, টিকিট কাটতেই হবে। টিকিটের দাম গেল আলেকজাণ্ডারের পকেট থেকে। অবশ্য সেটা আলেকজাণ্ডার উশুল করে নেবে। আমার সব খরচ সে অক্লেশে বহন করে চলেছে, রসিদ রাখছে, এমন কী ট্যাক্সি ভাড়ারও রসিদ পাওয়া যায় এখানে। সব রসিদ একসঙ্গে জমা হবে ইণ্টের

নাশিওনের দপ্তরে।

'ঐ যে রলফ নিজের কাজ।'

ষ্টুডিওতেও দেখে এসেছি, সমকালীন আর্টিস্ট হলেও রলফ বেশ খেটে এবং মন দিয়ে ছবি আঁকেন। ল্যাণ্ডস্কেপ আঁকেন। কিন্তু রলফের ল্যাণ্ডস্কেপ ভিন্ন প্রকৃতির বা গুণের, ক্লাসিক ল্যাণ্ডস্কেপ বা ইমপ্রেশনিস্ট ল্যাণ্ডস্কেপ বা এক্সপ্রেশেনিস্ট ল্যাণ্ডস্কেপ, কিছুর সঙ্গেই সাদৃশ্য নেই। গাছপালা, নদী, পাহার, মাঠ-ঘাট কোনও রূপেরই নেই সাদৃশ্য। রলফের ছবি কিছুটা জ্যামিতিক এবং রঙ রেখার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য মিতালী। লক্ষ্য করলাম আরও অনেক শিল্পীর কাজেই আন্তরিকতার অভাব নেই, নতুন কিছু করার সংকল্পে তারা আপ্রাণ প্রয়াসী। এক প্রবন্ধে পড়েছিলাম, সমকালীন আর্ট-এ জার্মানীর আর্টিস্টরা আজ সবার আগে। বোধ হয় প্রবন্ধ রচয়িতা এদের কাজ দেখেই ও মন্তব্য রেখেছেন।

মিউনিখ সফর প্রায় শেষ হতে চলেছে। একটু আধটু নিজে ব্যঙ্গচিত্র আঁকি। সে পরিচয়টাও পেয়েছেন আমার প্রোগ্রাম অর্গানাইজার। স্থানীয় ব্যঙ্গচিত্রী সঙ্ঘের সঙ্গে আমার পরিচয় হওয়া উচিত। খুব ভালো প্রস্তাব। কিন্তু মুশকিল হলো ভাষাটা, আমার কথা কেমন করে বুঝবেন ওঁরা? দোভাষীর কাজ করবে আলেকজাণ্ডার, কিন্তু ওভাবে কী ভাব আদান প্রদান যায়? সঙ্ঘের নাম কার্টুন ক্যারিকেচার কনটোর। স্থানীয় কার্টুনিস্ট বরিস্লাভ সাজতিনাক-এর প্রদর্শনী চলছিল। প্রদর্শনীর নাম ল্যাবরিনথ প্রাইভ। সাজতিনাক নামটা নিশ্চয় জার্মান নয়। মিউনিখে সাজতিনাক খুব জনপ্রিয় শিল্পী। রুশী কী যুগশ্লাভ, কী ফরাসী, কী জার্মান তাতে কিছু এসে যায় না, কার্টুনে সারা ইউরোপে চলেছে যেন একই চিন্তাধারা, নামেই শুধু ওঁরা ভিন্‌দেশী।

একটা সুভেনীর কেনার ইচ্ছা হলো কিন্তু দাম শুনে

আমার পকেটের হাত পকেটেই রয়ে গেল। সামনে বসে ছিলেন আরগো কক, কনটোরের সেক্রেটারি। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে একটি ক্যাটালগ আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন, 'আপনার জন্যে দাম নেই।' ওদেশে বর্তমানে যে সব রসিকতা হচ্ছে, তা আমাদের কাছে অনেক সময় কিঞ্চিৎ বাড়াবাড়ি. কিছুদিন আগে শিল্পী শুভাপ্রসন্ন ফরাসী সাপ্তাহিক 'শারলী এবদো'র কয়েক কপি আমাকে দেয়। আমাদের অফিসের আর্ট ডিরেক্টর একটি ভারতীয় অর্ধ-নিউড ছবি টাঙিয়ে রেখেছিলেন ডিপার্টমেণ্ট-এ। কার্টুনিস্ট কুট্টি সাহেব এসেছিলেন, তাঁকে দেখালাম ফরাসী পত্রিকাগুলি। মলাটের কার্টুন দেখে তো তাঁর চক্ষু ছানাবড়া! যখন বেরিয়ে যাচ্ছেন তাঁর চোখ পড়ল অর্ধ নিউড ছবিটির উপর। ফরাসী পত্রিকার মলাটের দিকে ফিরে তিনি মন্তব্য করলেন, 'হোয়েন দিস উইল কাম টু ইণ্ডিয়া, ছাট উইল গো!'

বেদের যুগ থেকে আমরা, হিন্দুরা, যাঁকে পূজা করে আসছি, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা যিনি, সেই মহাদেব-লিঙ্গ ওদেশে কৌতুকের বিষয়? পুরুষাঙ্গ নিয়ে কতই না মশকরা হয়। এইখানেই ফারাক, ওদের দর্শন আর আমাদের দর্শনের মধ্যে। প্রদর্শনী দেখতে আসছে নারী-পুরুষেরা এবং লক্ষ্য করলাম হেসে খুন হচ্ছেন নারীরাই বেশি।

কার্টুনিস্টদের সঙ্গে পরিচয় হলো। তাঁদের ইচ্ছে আমিও যোগ দিই মাঝে মাঝে ওঁদের সঙ্গে। বললাম, 'দেশে ফিরে কার্টুন পাঠাব।' সব দেশেই কার্টুনিস্ট সঙ্ঘ আছে, নেই শুধু এখানে। অবশ্য সঙ্ঘ করার মত কার্টুনিস্টের সংখ্যাই বা কোথায় এদেশে? একটা কথা আমাদের দেশে মহিলা কার্টুনিস্ট একজনকেও খুঁজে পাওয়া যাবে না। ওদেশেও কালেভদ্রে মহিলা কার্টুনিস্টের সন্ধান মেলে। কারণটা কী? ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করতে, কথায় বার্তায়, তাঁরাও তো নেহাৎ কম যান না দেখি!

সেদিন আর তেমন কাজ নেই। বেশ সকালেই ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। আলেকজাণ্ডার আসতে আরও দু-ঘণ্টা বাকি। কার সঙ্গেই বা কথা বলব? আমার কথা তো বুঝবে না কেউ। বেরিয়ে পড়লাম রাস্তায়, যত দূর একা একা হাঁটা যায়! কিছুক্ষণের জন্যে স্বাধীনতা লাভ করেছি। যেখানেই যাই সঙ্গে থাকে আলেকজাণ্ডার, এ এক বিপদ। ছেলেটি খুবই ভদ্র, কিন্তু সব সময় সঙ্গে লেগে থাকলে কাঁহাতক আর ভালো লাগবে? আলেকজাণ্ডার সাবধান করে দিয়েছিল, কখনও যেন একা না ঘুরি, হারিয়ে যাবার সম্ভাবনা। দেখাই যাক না হারিয়ে যাই কি না। বার্লিনে ট্রাম গাড়ি দেখতে পাইনি, আধুনিক বার্লিন মন্থরগতির বাহনটি বর্জন করেছে, কিন্তু মিউনিখ অত আধুনিক নয়, মিউনিখে দিব্যি দু-গাড়ি, তিন-গাড়ি-বিশিষ্ট ট্রাম চলেছে গজেন্দ্র গমনে, রাস্তার মধ্যিখান ধরে। রাস্তার নিচে আছে ইউ-বান। ফরাসীরা যাকে বলে মেত্রো; ইংলণ্ডে যাকে বলে টিউব, কানাডায় যার নাম সাবওয়ে, তারই আখ্যা জার্মানীতে ইউ-বান, অর্থাৎ পাতাল রেল। মর্যাদায় জার্মানীতে মিউনিখ শহর তৃতীয় স্থানের অধিকারী। বার্লিন দ্বিখণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও প্রথম। হ্যামবুর্গ দ্বিতীয়। তবে আর্টের দিক থেকে মিউনিখ প্রথম। যেমন সমৃদ্ধ সুকুমার কলাসংগ্রহ তেমনই আকর্ষণীয় স্থাপত্য ঐশ্বর্য। পশ্চিম বার্লিনের মতো অত হইচই নেই অবশ্যই। রাত্রে বয়ে যায় আলোর বন্যা। ওদের কী মজা, ওখানে লোডশেডিং হয় না! মিউনিখে স্কাইস্ক্রেপার বাড়ি দেখা যাবে না, মার্কিন প্রভাব লেশমাত্রও পড়েনি। বদলে, আকাশ ফুঁড়ে উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে অগুনতি গীর্জার চুড়ো।

গ্লকেনস্পিয়েলে শব্দ হলো, মারিয়েনপ্লাৎস-এ শয়ে শয়ে ছেলে-মেয়ে বুড়ো সবার দৃষ্টি তখন ওই সৌধের মাথার দিকে, অনেকে ক্যামেরা রেডি করে নিয়েছে। দুই যোদ্ধা, ঘোড়ায় চড়া, সেই সাবেকী আমলের বর্ম আর হাতিয়ার। বল্লম বাগিয়ে তারা তেড়ে গেল

পরস্পরের দিকে। এ দৃশ্য প্রতিদিন ঘটে আর কৌতূহলী দর্শকের দল প্রতিদিনই জমা হয় নিচে মুহূর্তটির অপেক্ষায়।

কলকাতা থেকে রওনা হবার আগে এক ভদ্রলোক, যিনি বলতে গেলে এ বেলা ওবেলা মিউনিখ দৌড়ান, শহরটি সম্বন্ধে যা আইডিয়া দিয়েছিলেন, তার সঙ্গে খুব একটা মিল খুঁজে পেলাম না। ছোট বটে, কিন্তু খুব ছোট শহর মিউনিখ নয়। লোকসংখ্যায় কলকাতাকে কে হারাবে? ভোজনবিলাসীর স্বর্গ মিউনিখ শহরে আছে অজস্র রেস্তোরাঁ আর কাফে। ফুল ব্যবসায়ীদের আয় বোধ করি রেস্তোরাঁর মালিকদের চেয়েও বেশি। কী রঙ আর কী বাহার ফুলের দোকানে! একা একা বেশ ঘুরে বেড়াচ্ছি, পথচারীদের চোখে চোখ পড়তে মৃদু হেসে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। লক্ষ্য পড়ল কিছুটা রাস্তা খোঁড়া। ইউ-বান তৈরি হচ্ছে, আমাদের কলকাতার পাতাল রেলের মতো অমন হবোডহাটি ব্যাপার নয়, তা হলেও পথচারীদের অসুবিধে কিছুটা হচ্ছে বৈকি। এবার ফেরা দরকার। কোন পথে এসেছি ঠাহর করতে পারছি না, বাড়িগুলো সবই যেন এক রকম। একবার এদিকে যাই একবার ওদিকে যাই। নিঃসন্দেহে রাস্তা হারিয়ে ফেলেছি। সাহস করে লম্বা চওড়া একজনকে জিগ্যেস করে বসলাম, 'রেল স্টেশনটা কোন দিকে?' ভদ্রলোক ইংরেজি বোঝেন এবং বলতেও পারেন। আমাকে সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত হলেন স্টেশনের সামনে। 'টিকিট কাটা হয়েছে?' বললাম, 'ট্রেনের টিকিটের দরকার নেই, পকেটে প্লেনের টিকিট আছে। থাকি ওই ইডেন হোটেলে, আজ সন্ধ্যায় চলে যাচ্ছি।'

হোটেলে আমার সরকারী সঙ্গীকে অপেক্ষমান দেখে কাচুমাচু হয়ে বললাম, 'একটু হাঁটতে বেরিয়েছিলাম, দেরি হয়ে গেল।' পথ হারিয়ে ফেলেছিলাম সে কথা প্রকাশ করার কি দরকার? আলেকজাণ্ডারের সঙ্গে ট্যাক্সি চেপে আবার কিছুক্ষণ শহর দেখা, তারপর দ্বিপ্রাহরিক ভোজন। খাবার টেবলে বসে জিগ্যেস করলাম, 'আমি চলে গেলে

তোমার তো ছুটি তাই না ?'

'না, আজ সকালেই হুকুম হয়েছে দুজন নাইজেরিয়ান গেস্টকে আপ্যায়ন করতে হবে, তাঁরা এসে পৌঁছচ্ছেন কাল সন্ধ্যায়।'

'তা, মাসে তোমাকে এমন কজন গেস্টকে শহর দেখাতে হয় ?'

'কখনও কখনও দু-তিন মাসও ফাঁকা যায়, তবে বেশিরভাগ সময় প্রতি মাসে দু-একজন গেস্ট থাকেনই।'

'নাইজেরিয়ানরা কি তোমাদের আর্ট কালেকশন দেখতে আসছেন ?'

'না, তেমন কোন বিশেষ বিষয়ে কৌতূহল নেই তাঁদের, শহর দেখবেন।'

বিকেল চারটে নাগাদ এয়ারপোর্টে পৌঁছে দিয়ে আলেকজাণ্ডার বিদায় নিল। আরও প্রায় আধঘণ্টা ছিলাম মিউনিখে, তবে তা প্রায় বন্দী অবস্থায়, রেলিং ঘেরা চৌহদ্দির মধ্যে। মাইকে জার্মান ভাষায় কি যে ঘোষণা হচ্ছে কিছুই বুঝতে পারছি না, সব প্যাসেঞ্জাররা যা করছে, দেখাদেখি আমিও তাই করে চলছি। একটা ঠেলাগাড়ি সামনে এসে হাজির হলো। গাড়ি ভর্তি প্লাস্টিকের থলি। থলিতে ফল, স্যাণ্ডুইচ, কেক ইত্যাদি। কাদের জন্যে ? প্যাসেঞ্জারদের মধ্যে একজন চট করে একটি থলি তুলে নিলেন, তারপর আরেকজন, তারপর আরেকজন, আমিই বা বাদ যাই কেন, কিন্তু কিন্তু করে আমিও তুললাম একটি। সবাই এগোতে লাগল সামনের গেটের দিকে, সুড়ঙ্গ পথ ধরে পৌঁছে গেলাম একেবারে এরোপ্লেনের পেটের মধ্যে। এয়ার হোস্টেস আমার হাতের ঝোলাটা নিয়ে বাঙ্কের ওপর রেখে দিয়ে বসতে আজ্ঞা করল সিটে। কোনো আপত্তি না করে বসে পড়লাম। মিনিট দশেক পর লুফৎহানসার উড়ুক্কু হাঁসটি মিউনিখের মাটি ত্যাগ করল। চললাম হ্যামবুর্গে।

# হামবুর্গ-এর হ্যামবুর্গের
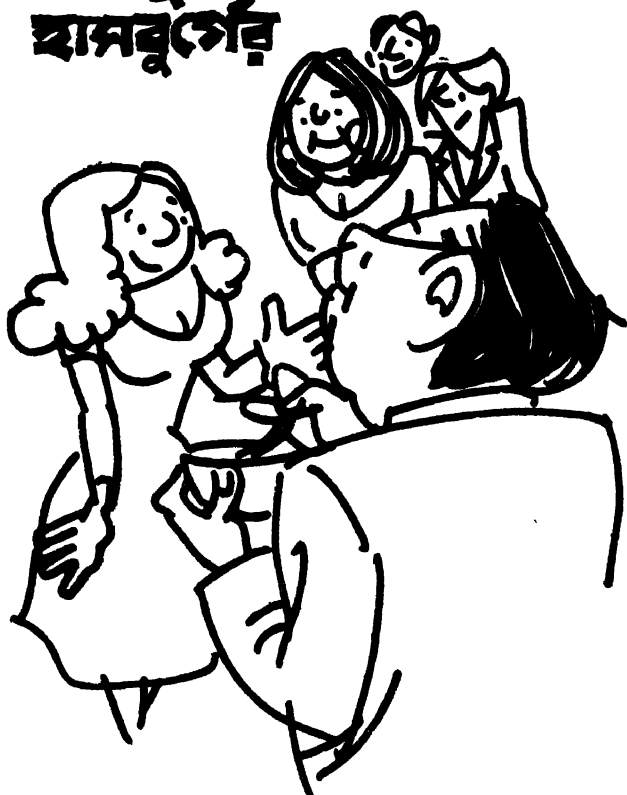
এয়ারপোর্টে স্বাগতম জানাতে এসেছেন এক ভদ্রমহিলা। বার্লিনে আর মিউনিখে সঙ্গী পেয়েছিলাম দুই পুরুষকে, হামবুর্গ দেখানোর ভার পড়েছে ইঙ্গে বার্থ দ পালাসিওর ওপর। শ্রীমতী পালাসিও এক পোর্টার নিযুক্ত করে দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁর অতিথির সঙ্গে আছে না জানি কতই না মালপত্র! আমার লাগেজ সেই ছোট্ট টুকটুকে লাল সুটকেশটা দেখে পালাসিওর দমকা হাসি! এয়ার-পোর্টের ফটক পেরোতেই ভাগ্নীজামাই চন্দ্রশেখরের সঙ্গে দেখা। চিঠি পেয়ে সে এসেছে। চন্দ্রশেখর লুফটহানসার ইঞ্জিনিয়ার। কিন্তু ফ্যাসাদ হল, চন্দ্রশেখরের সঙ্গে যাব না পালাসিওর সাথে যাব?

চন্দ্রশেখরকে বললাম, "বোঝাও মহিলাকে তোমার ইচ্ছাটা জার্মান ভাষায়।" ঠিক হল চন্দ্রশেখরের গাড়িতে প্রথমে তো তার ডেরায় চলা হোক, সেখানে পালাসিও-ও যাবেন, চা খেতে খেতে ঠিক হবে কি করণীয়। পালাসিওর বয়স ৩৫/৩৬, জার্মান। এক স্পানিয়ার্ডকে বিবাহ করে হয়েছেন মিসেস পালাসিও। ভাগ্নী অনুব ইচ্ছে তার অতিথি হয়েই হামবুর্গে কটা দিন কাটাই। কিন্তু পালাসিওর কথা, "মালিকের জন্যে যে হোটেল আটলান্টিকে ঘর নেওয়া রয়েছে!" হোটেল আটলান্টিক শহরের অভিজাত হোটেলগুলির অন্যতম। আটলান্টিক শুনে চন্দ্রশেখর রায় দিল ইণ্টের নাশিওনের আতিথেয়তায় আমার যে কদিনের অবস্থান হামবুর্গে, সে কদিন ও-হোটেলে বাস করার সুযোগটা নষ্ট করা উচিত হবে না, সরকারী সফর শেষ হবার পর বরং তারা ভার নেবে আমার। খুবই বুদ্ধিমানের মত রায়! ভাগ্নীর হাতের ভারতীয় চা পান করে পালাসিওর তারিফের অন্ত নেই। ও-চা পাবে কোথায় ওরা? একেবারে তাজা দার্জিলিং চা। এক প্যাকেট চা উপহার পেয়ে পালাসিও আনন্দে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিলেন। রাত্রে না খাইয়ে ভাগ্নী ছাড়বে না আমায়।

বার্লিনে এবং মিউনিখেও বড় বড় হোটেলে খেয়ে এসেছি, হোটেল আটলান্টিক যেন আরও কেতাদুরস্ত। সকালবেলা স্নান সেরে বসে আছি, টেলিফোন বেজে উটল, "পালাসিও বলছি, রাত্রে কেমন ঘুম হল? কোনও অসুবিধে হচ্ছে না তো? ব্রেকফাস্ট হয়ে গেছে?" শ্রীমতী পালাসিও ফোন করছিলেন হোটেলের একতলা থেকে, দোতলা থেকে নেমে এলাম একতলায়।

পালাসিও পদবীটা ব্যবহার করলেও ইঙ্গের বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে গেছে। শ্রীমতীর সঙ্গে ঘোরা ফেরা করতে করতে পরে ব্যাপারটা জেনে নিয়েছিলাম। মহিলা খুব স্মার্ট। কোনও সঙ্কোচ নেই। পুনর্বার বিবাহ না করা পর্যন্ত প্রাক্তন স্বামীর পদবীটাই চলবে, কিছু 'টেকনিক্যাল' সুবিধের জন্যে।

আটলান্টিক হোটেলের খুব কাছে রেলস্টেশন। স্টেশনের পাশেই হামবুর্গের কুন্সঠাল। গেছি হামবুর্গ শহরের শিল্প সংগ্রহ দেখতে, শুরু হল দেখা হামবুর্গ কুন্সঠাল থেকে। জার্মান ভাষায় 'কুন্সট' মানে আরট আর 'হাল' হল হলঘর। তবে একটা আধটা হলঘর নয়, মস্ত বাড়ি কুন্সঠালের, অনেক ঘর। সংরক্ষণাগারটি মূল তিনটি ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে দোতলায় আছে ওল্ড মাস্টার-দের কীর্তি, ১৫ থেকে ১৮ শতকের চিত্রকারদের কলাকৌশল। দোতলাতেই দ্বিতীয় ভাগ, ১৯ থেকে ২০ শতকের বিপ্লবী শিল্পীদের কাণ্ডকারখানা, একতলায় তৃতীয় ভাগে—কেবল মাত্র হামবুর্গবাসী শিল্পীদের আরট।

নামকরা আরট মিউজিয়াম ইউরোপে বোধকরি একটিও নেই যেখানে রুবেন্সের ছবি অনুপস্থিত। রুবেন্সের জনপ্রিয়তা যে কিভাবে সারা ইউরোপ ছেয়েছিল তা এ থেকেই বোঝা যায়। রনেসাঁস শিল্পীদের কৌলীন্য অবশ্যই অনুভব করা যাবে না কুন্সঠালে। সে অভাব পূরণ হচ্ছে বললে বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে, তাহলেও রনেসাঁস কালেরই জার্মান শিল্পী মাস্টার ফ্রাংকের ছবি অসাধারণ মুন্সিয়ানার পরিচায়ক। মধ্যযুগীয় প্রথম সারির শিল্পীদের পাশে ফ্রাংককে আসন দিতে দ্বিধা হয় না। কুন্সঠাল ছাড়া আর কোথায় ফ্রাংকের চিত্রকলা দেখা যাবে বলতে পারব না। ছবিগুলি ধর্মভিত্তিক, কিন্তু বাস্তবতাও কিছু কম সোচ্চার নয়; নিঃসন্দেহে অতি উচ্চমানের কলাকৌশল। আশ্চর্য হতে হয়, শিল্পীর পেশা ছবি আঁকা ছিল না, ইনি ছিলেন সেন্ট জনস কনভেন্টের এক ডমিনিকান সন্ন্যাসী।

১৭ শতকের ফ্লেমিশ আরট-এর শীর্ষ আসনটি দখল করে বসে ছিলেন পিটার পল রুবেন্স। নিঃসন্দেহে রুবেন্স গুরু বলে মেনে ছিলেন পূর্বসূরী ইতালীয় মাস্টারদের—হাই রনেসাঁস থেকে শুরু করে কারাভাগিও পর্যন্ত। সঙ্গে ছিল তার ফ্লেমিশ ট্র্যাডিশন;

দুয়ের সংশ্লেষণে সৃষ্টি হল এক শক্তিশালী আঙ্গিক। বিশেষজ্ঞরা নামকরণ করলেন 'বারোক'। রুবেন্স, তাঁর শিষ্যরা এবং তাঁদের অনুগামীরা এক সময় আরট সমঝদারদের কাছ থেকে বাহাদুরী পেয়েছেন সর্বাপেক্ষা। তাঁদের নেতৃত্ব না মেনে চলার মত সাহস খুব কম সমধর্মার ছিল তখন। কুন্সঠালে হাই বারোক নাটকে অলঙ্কৃত রুবেন্স ক্যানভাসগুলির সামনে সম্মোহিত না হয়ে থেমে সরে যাওয়া কোনও রসিকেরই সাধ্য নয়! কি সূক্ষ্ম স্পর্শ আর কত গভীর অনুভূতি। আর রচনা? রুবেন্স ছাড়া ও রচনা অন্য কে পারবে? রুবেন্সের প্রধান শিষ্য ও সহকারী, এবং পরবর্তীকালে মাস্টার হিসেবে স্বীকৃত অ্যানটনি ফান ডাইক এক জাত শিল্পী! জাকব জরডেনস আর ফ্রান্স স্নীডারসঃ আরও দুই রুবেন্স শিষ্য এবং বারোক মাস্টার। জ্যান ফিট এবং পল দ ভস্ প্রমাণ রেখেছেন ফ্লেমিশ আরট-এ কোনও সতীর্থর চেয়ে তাঁরাও কিছু কম ছিলেন না।

এবার আসা যাক ওলন্দাজ শিল্পী রেমব্রান্টের সামনে। ওলন্দাজ কলাকৌশলে সেই ইতালীয় রনেসাঁসেরই প্রবাহ। ল্যাণ্ডস্কেপ, পোর-ট্রেট, স্টিল লাইফ—সবের মধ্যেই রেয়ালিজমের চূড়ান্ত। বলে রাখি, যে সময় সারা ইউরোপে চলেছে রাজপুরুষদের মন রেখে আর ধর্মীয় গুরুদের ফরমাস মত ছবি আঁকা, হল্যাণ্ডে তখন গুটিকয়েক শিল্পী, প্রধান রেমব্রান্ট, আঁকছেন নাগরিকদের, ছবি উঠছে গিয়ে নাগরিক-দেরই ঘরে। কোনও কোনও রচনায় ধর্মে অনুরাগ অবশ্যই প্রকাশ পেয়েছে, তা হলেও সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা শিল্পীদের ছিল প্রধান লক্ষ্য। যখন দেশে প্রোটেস্টাট চার্চের দাপট, রেমব্রান্ট যে কোন্ সাহসে জনসাধারণ নিয়ে মেতে উঠলেন সেইটেই ভাববার। ফ্রান্সে আরও দু'শ বছর পর, তখন না আছে কোনও রাজা, না আছে পাদরীদের হাঁকডাক, ইমপ্রেশনিস্টরা তুচ্ছ নাগরিকদের এনে বসিয়ে ছিলেন সাদরে তাঁদের রচনায়। কিন্তু ১৭ শতকে ঐ চিন্তাধারা

দুঃসাহস নয় ? মুন্সিয়ানা বিচার করে কার পাশে রাখব রেমব্রান্টকে ? রুবেন্সের না ভেলাসকেসের ? কাল্পনিক ল্যাণ্ডস্কেপ, মানব প্রতিকৃতি, সমকালীন জীবন আর মাঝে মাঝে দু একটি খৃষ্টান উপাখ্যানের ইলাসট্রেশন—রেমব্রান্টের আরট। উপাখ্যানের মধ্যেও মানবতাই যেন প্রধান লক্ষ্য, ধর্মপ্রচার নয়। রেমব্রান্টের শৈলী কিয়ারোস-কিউরো, এক পাশে আলো আর অন্যদিকে আঁধার সোচ্চার হয়ে উঠে এক নাটকীয় দৃশ্যের হয় অবতারণা। এ শৈলী নিশ্চিত ভেলাসকেসের প্রভাব। ওল্ড মাস্টারস ঘরের শেষ ছবি স্পেনের শিল্পী গোয়াইয়ার। গোয়াইয়ার অঙ্কনে পরবর্তীকালের কলাকৌশল অর্থাৎ মডার্নিসমের সূচনা স্পষ্ট।

হামবুর্গ কুন্সঠালের বৈশিষ্ট্য—প্রথাগত আরট আর মডার্ণ আর্টের সহাবস্থান এক ছাদের নিচে, যেটা বার্লিনে নেই, মিউনখে নেই, পারীতেও নেই। তবে একেবারে সমকালীন আরট—হাঁচি কাশির মত শিল্পীর তুলি-কালি-পেন্সিল দিয়ে বেরিয়ে আসা কলাকৌশল বোধকরি কুন্সঠালের কর্তৃপক্ষও মূল্যবান মনে করেন না। রোমান-টিসিস্‌ম্‌, রিয়ালিসম, ইমপ্রেসনিসম, পোয়াঁতিলিসম, ফোবিসম, কিউবিসম, প্রিমিটিভিসম, ওরফিসম, এক্সপ্রেশনিসম, অ্যাবষ্ট্রাকটিসম ইত্যাদি—বিরাট এলাকা। তালিকায় উল্লেখযোগ্য শিল্পী—কোরো, কুরবে, মনে, মানে, ত্যাগা, রনোয়ার, সেজান, গর্গ্যা, ভুইয়ার, বজার, ভ্‌লামাঁক, মারকে, লিবেরম্যান, করিনথ, মুঙ্ক, অঁসোর, রুসো, নোল্ডে, স্মিড রুটলফ, পিকাসো, লেজ্যার, দোলোনে, শাগাল, কানডিনস্কী, মার্ক, ক্লী, বেকম্যান, কোকোসকা, আর্ণস্ট এবং জিয়াকোমেত্তি। এঁরা চিত্রকর। ভাস্করদের মধ্যে আছেন রদ্যাঁ, মাইয়োল, বারলাক, মারিনোমারিনি, লোরেন্স, মূর, আরপ এবং কলডার। রনোয়ারের এবং মাতীসের ভাস্কর্য সম্বন্ধে একটু আধটু শুনেছিলাম বটে কিন্তু বিস্তারিত আলোচনা কোথাও পড়িনি। কুন্সঠালে রনোয়ারের ভেনাস দেখলাম। রনোয়ারের মূর্তি গড়ার

পরিচয় প্রথম পাই বার্লিনে। শিল্পীর চিত্রকলা এবং ভাস্কর্যের মিল খুব। স্থূলকায়া নারী ছবিতেও এবং ভাস্কর্যেও। আরেক ফরাসী শিল্পী পল গগ্যাঁর জুরনালে পড়েছি হৃষ্টপুষ্ট রমণীর সন্ধানে তিনি সারা জীবনটাই কাটিয়েছেন। ফরাসীদের এ দুর্বলতা কেন? ভাস্কর মাইয়োল-ও মাংসল রমণী, অবশ্য ব্রোঞ্জে, উপস্থাপন করেছেন একের পর এক। নাকি, ভলিউমটাই দ্রষ্টব্য! রনোয়ার আর মাইয়োলের কাজ প্রায় একই রকম। বার্লিনের মডার্ণ আরট মিউজিয়ামের সংগ্রহ বিরাট কৃষ্ণকায়া নিউডটি মাইয়োলের বলেই মনে হয়েছিল। পায়ের কাছে স্পষ্ট রনোয়ারের দস্তখত দেখে বুঝেছি ওটি রনোয়ারের কীর্তি। ওদের দেখাদেখি ভারতীয় ভাস্করদের মধ্যেও কেউ কেউ স্ত্রী দেহের ভলিউম উপস্থাপনে মনোনিবেশ করেছেন লক্ষ্য করা যায়।

১৯১৯ সালে উইমারে বাওহাওস নামে একটি আরট শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে বাওহাওসের ঠিকানা বদলায়। ব্লু রাইডার কানডিনস্কী এবং পল ক্লীর তালিম বাওহাওসে। বাওহাওসের মতবাদ—স্থাপত্যকলা, সুকুমার কলা, ব্যবহারিক শিল্প, কারিগরি শিল্প—সবই উচ্চমানের আরট, ছোটবড় জাতিতে এদের পংক্তিস্থ করা গর্হিত। একের সঙ্গে অন্যের গাঁটছড়ায় কোনও বাধা নেই। হিটলার বাওহাওস প্রতিষ্ঠানটিকে বন্ধ করে দেন। কেন, সেটা আমার পক্ষে বলা কঠিন। জার্মান এক্সপ্রেসনিসমের নামকরারা বেশীরভাগই বাওহাওসের প্রাক্তন। বাওহাওসের দীক্ষায় শিক্ষিত শিল্পীদের দারুণ রবরবা কুসময়ে। ভাগ্যিস হিটলার গত হয়েছেন।

৫০০ বছরের মধ্যে, অর্থাৎ ১৫ থেকে ২০ শতকের হামবুর্গবাসী শিল্পীদের স্বতন্ত্র প্রদর্শনী। নিপুণ কাজের অবশ্যই অভাব নেই, কিন্তু হামবুর্গেররা যেন কোনও বৈশিষ্ট প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন নি। সমকালীনরা মিউনিখের ব্লু রাইডার কিংবা বার্লিনের ব্রুকেদের

মত কোনও ঘরোয়ানা গড়ে তুলতেও পারেন নি।

সাথী ইঙ্গে যে আরট বিষয়ে খুব ওয়াকেফহাল নয় তা দু চার কথাতেই বুঝে নিয়েছিলাম। কুনসঠালে সম্বন্ধে জানতে পারব কি করে? ইংরাজীতে লেখা কোনও বইপত্র পাওয়া যাবে না? একবার এর কাছে যাই, একবার ওর কাছে যাই, সবারই এক উত্তর, "ইংরাজীতে ছাপা কিছুই নেই!" হতাশ হয়ে বেরিয়ে আসছি, এক সাহেব চিৎকার করছেন, আমাদেরই দাঁড়াতে ইঙ্গিত করছেন। হন্ত-দন্ত হয়ে সামনে এসে বললেন, "কোনও রকমে খুঁজে পেতে এই একটা ইংরেজী গাইড পাওয়া গেছে।"

"কত দাম?"

"দাম দিতে হবে না!"

এক মুহূর্তও অপেক্ষা নয়, সাহেব অ্যাবাউট টার্ণ! শুনলাম ভদ্রলোক হামবুর্গ কুনসঠালের ডিরেকটর। স্বয়ং ডিরেক্টর কৌতূহলী অপরিচিত দর্শকের হাতে গাইড ধরিয়ে দিয়ে গেলেন।

এবার কোথায় গন্তব্য? "নিশ্চয় আপনার খিদে পেয়ে গেছে? আপনাকে ভারতীয় খানা খাওয়াব আজ।" মিউনিখে চাইনীজ খানা বলে কি খাদ্যই না খাইয়েছিল আলেকজাণ্ডার! ঐ জাতীয়ই কিছু হবে ভারতীয় খানা! কৌতূহল দেখিয়ে প্রশ্ন করলাম "হামবুর্গ শহরে ভারতীয় খানাও পাওয়া যায়?"

"নিশ্চয়!"

"চলুন, দেখব কেমন ভারতীয় খানা!"

লাঞ্চে নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন, স্থানীয় নামকরা এক আরট সমালোচক, ডাঃ ফ্লেমিং। উদ্দেশ্য, ভারতীয় কলা সমালোচকের সঙ্গে জার্মান সমালোচকের পরিচয় ঘটান। আমরা কিছুটা দেরী করে ফেলেছিলাম, ক্রিটিক আগেই উপস্থিত হয়ে অপেক্ষা করছিলেন। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়েছিলেন রেস্তোরাঁর ম্যানেজার। আমাদের তিনি সম্ভাষণ জানিয়ে ভেতরে নিয়ে গেলেন; জিগ্যেস করলাম, "ঠিক

ভারতীয় খানা তো?" আমার প্রশ্নে সন্দেহ প্রকাশ পাচ্ছে, ম্যানেজার আমার চোখের দিকে তাকালেন। জার্মান ক্রিটিক ফেঁদে বসলেন নানান দেশের খাবার গল্প। তাঁকে সমকালীন জার্মান আরট সম্বন্ধে যতই প্রশ্ন করি দু এক কথায় জবাব দিয়েই ভদ্রলোক আনেন খানাদানার প্রসঙ্গ। টেবলে খাবার এল—দেহ্রাডুন রাইসের ঝরঝরে ভাত, মুরগীর মাংসের কারী, ডাল আর একটা নিরামিষ তরকারী। ভাতের ওপর দুটো করে পাঁপড় ভাজা রাখা। মুরগীর কারীর একেবারে ভারতীয় স্বাদ। তাজ্জব! এসব মসলা-পাতি পেল কোথায় ওরা? রাঁধলই বা কে? নিশ্চয় ভারতীয় রাঁধুনে! না ভারতীয় রাঁধুনে নয়, এক জার্মান যুবককে ভারতে পাঠিয়ে, ভারতীয় পাক প্রণালী শিখিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। শেষ পাতে টক দই! অনুষ্ঠানের কোনও ত্রুটি নেই! এমন কি পাশে ঠাণ্ডা জলের গ্লাস—যেটা সারা ইউরোপে কোথাও দেখিনি। যোগুর আর দই একই বস্তু; যোগুর সাধারণত পাওয়া যায় কাগজের গ্লাসে, কিন্তু এখানে দই এল কাচের বাটিতে। আহার্য সামনে আসার মুহূর্ত থেকেই ডাঃ ফ্লেমিং সব আলোচনা বন্ধ করে ভক্ষণে মনোনিবেশ করছেন, তাঁর ক্যালোরি কম হলে চলবে না। তিনি উদরস্থ করলেন আমার থেকে প্রায় তিন গুণ। ইঙ্গেও কিছু মন্দ গ্রহণ করল না, তারও চিন্তা ক্যালোরি। আহারান্তে ম্যানেজারের কাছে স্বীকার করলাম, "সত্যিই ভারতীয় খানা খেয়েছি!" ম্যানেজারের বুক যেন দশ হাত ফুলে উঠল। ডাঃ ফ্লেমিং-এর ভারতীয় ক্রিটিকের সঙ্গে পরিচয় করা অপেক্ষা ভারতীয় খানার স্বাদ গ্রহণের বাসনাটাই ছিল প্রবলতর!

হামবুর্গ অ্যাকাডেমিতে দেশ-বিদেশ থেকে ছাত্রছাত্রী জমা হয়। সেখানকার বর্তমান ডিরেক্টর ডক্টর কার্ল ভোগেল। ভারতীয় গ্রাফিক আর্টিস্ট লক্ষ্মা গৌড় এক সময়ে হামবুর্গ অ্যাকাডেমিতে কাজ করে গেছে। ইঙ্গে টেলিফোনে জানিয়ে দিয়েছিলেন, আমরা যাচ্ছি।

অ্যাপয়েন্টমেন্ট ব্যতীত ডিরেক্টরের সঙ্গে দেখা হওয়া মুস্কিল। যখন পৌঁছলাম, সাহেবের সেক্রেটারী জানালেন, সাহেব আমাদের অপেক্ষা করতে বলে গেছেন। সাহেবের ঘরেই অপেক্ষা করতে হবে। সাহেবের ঘরে অনেক টেবল, আর প্রত্যেক টেবলেই বইয়ের পাহাড়, কাগজপত্র এলোমেলো ছড়ান, মেঝেতেও বেশ কয়েকটা কাগজ। টেবলের ওপর, বইয়ের ওপর ধুলো। ওরই ফাঁকে দু-তিনটি কুরসি। একটা চেয়ার ঝেড়েঝুড়ে ইঙ্গে আমাকে বসতে বললেন, তারপর নিজে জায়গা ঠিক করে নিয়ে সামনের টেবলগুলোর দিকে হাত দেখিয়ে শুরু করলেন, "আপনি যখনই আসবেন, এই একই অবস্থা দেখবেন। এই রকম ধুলো আর অগোছাল, এটা ভোগেলের ইচ্ছাকৃত ...' কথা শেষ হবার আগেই ডিরেক্টরের প্রবেশ! সেরেছে! নিশ্চয় ডাঃ ভোগেল শুনতে পেয়েছেন! হ্যাঁ, তিনি শুনেছেন, ঠোঁটের কোণে হাসি টেনে পুনরাবৃত্তি করলেন, "...ভোগেলের ইচ্ছাকৃত, হুম্?" কথা ঘুরিয়ে দিয়ে আমি বললাম, "ডক্টর, আমি এসেছি কলকাতা থেকে আপনার অ্যাকাডেমি দেখতে, আমি শুধুই ছবির সমালোচনা করি না, একটু আধটু নিজেও আঁকি। এখানে আপনার ছাত্রছাত্রীরা কি প্রথায় ছবি আঁকা শেখে, আমার কৌতুহল জানার।" "কফি খাবেন?" "তা চলতে পারে!" ডঃ ভোগেল কক্ষের বাইরে গেলেন কফির ব্যবস্থা করতে। আমার দিকে ইঙ্গে তখন নীল চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছেন। ভোগেল ফিরে এলেন। মাথার ছোট ছোট লালচে চুল সামনের দিকে টেনে নিয়ে আঁচড়ান, সিঁথি নেই, মনে হয় আঠা দিয়ে যেন চুলগুলো সেঁটে রাখা। উচ্চতায় মাঝারি, মাঝামাঝি স্বাস্থ্য, পুরু গরম কাপড়ের স্যুট পরিহিত ডঃ ভোগেলের চেহারা। গলার স্বর একটু কর্কশই বলা চলে। বললাম, "কিছু বইপত্র, মানে আপনার এই অ্যাকাডেমি সম্বন্ধে, পাওয়া যেতে পারে কী? আমাকে দেশে ফিরে গিয়ে কাগজে লিখতে হবে।" টেবলের ওপর রাখা বইগুলোর মধ্যে

থেকে টেনে টেনে বার করে ডক্টর খান পাঁচেক কেতাব আমার হাতে ধরিয়ে দিলেন। ইতিমধ্যে কফি এসে গেছে। ইঙ্গে বেশী কথা বলছেন না। জিজ্ঞেস করলাম অধ্যাপককে, ছাত্রছাত্রীদের আরট শিক্ষাদানের কোনও কারিকুলাম অনুসরণ করা হয় কিনা। "কারিকুলাম ? না, তেমন কিছু কারিকুলাম নেই। একেকজন শিক্ষক একেক চিন্তায় আর ধারায় শেখান। শিক্ষার্থীদের উচ্চতর ক্লাসে প্রমোশন দেওয়া শিক্ষকদের মতামতের ওপর নির্ভর করে। নিয়মিত ক্লাশ হয় এবং একই ক্লাসে দু তিন স্ট্যানডার্ডের ছাত্রছাত্রী একই সঙ্গে কাজ করে। কৌতূহল হল ক্লাস দেখার। সেটা ছুটির দিন ছিল, পুরোদমে অ্যাকাডেমি চলছিল না বটে, কিন্তু কিছু সিনিয়র ছাত্রছাত্রী একটি মস্ত বড় ঘরে খুব ব্যস্ত। ভোগেল প্রত্যেকটি ছাত্রছাত্রীর সঙ্গে এক এক করে করমর্দন করলেন। শিক্ষার্থীদের হাতে রঙ মাখা, তাতে কি হয়েছে! তারা যা খুশি করে চলেছে, কি আঁকছে বোঝা মুস্কিল! অন্য ঘরে গেলাম, সেখানে কোনও শিক্ষার্থী নেই, সেলোটেপ দিয়ে জোড়া অজস্র রঙীন আঁকিবুকি চার দেয়ালে; দু-একটি ল্যাণ্ডস্কেপের মত মনে হল। ব্যাপারটা বুঝে নিয়েছি। ডক্টরের দিকে চেয়ে বললাম, "আপনার অনেক সময় নষ্ট করলাম, কিছু মনে করবেন না।" হ্যাণ্ডসেকের পর চটপট পা চালিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে অ্যাকাডেমির সীমানা পেরিয়ে গেলাম।

এবার এক ব্যবসায়িক আরট গ্যালারীতে। প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে ম্যানেজার ভদ্রলোক ইঙ্গের দুগালে দুটি চুম্বন রাখলেন। পরিচিত স্ত্রীলোকদের সদ্ভাব জ্ঞাপনের ওদেশে ঐটেই রীতি।

ভদ্রলোকের বয়স চল্লিশের মধ্যে। বেশ লম্বা চওড়া। ইংরাজী বলতে পারেন না। ইঙ্গে দোভাষীর কাজ করছে। গ্যালারীর আসবাবপত্রে আভিজাত্য প্রকাশ পায় না, সংখ্যায়ও তা খুব কম। একটি আরামকেদারায় বসলাম, পাশেরটিতে ইঙ্গে, একটি ছোট্ট টেবলের ওপারে গ্যালারী-মালিক, তিনিই ম্যানেজার। আমার

আসনের পিছনে একটা কাঠের সিঁড়ি ঘুরপাক খেয়ে ওপরে উঠে গেছে। ঘরটি আসলে একটি, মধ্যিখানে কাঠের তলা যোগ করে হয়েছে ছুটি। একতলা এবং দোতলা ছুই তলাতেই ছবি সাজানো। গ্যালারীর সংলগ্ন অন্য একটি কক্ষে এক আরট স্কুল। বলাই বাহুল্য গ্যালারীরই পরিচালনাধীন। স্কুলে ছাত্র নেই, শুধুই ছাত্রী। বয়স তাদের ষোল থেকে বিশের মধ্যে বোধকরি। ছু একজন বয়স্ক মহিলা ঘোরাফেরা করছেন, তাঁরা শিক্ষিকা। গ্যালারীর মধ্যে দিয়ে স্কুলে প্রবেশ করতে হয়। ছাত্রীরা গ্যালারীতে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই ম্যানেজার তাদের একে একে জড়িয়ে ধরে সজোরে চুম্বন করছেন। বেশ আছেন তিনি! টেবলের ওপর চকলেটের কয়েকটা ছেঁড়া প্যাকেট! ম্যানেজার অতিথিকে আপ্যায়নের উদ্দেশ্যে আরও চকলেট কিনে আনতে পাঠালেন এক ছাত্রীকে। গ্যালারীটির অবস্থান কোনও বড় রাস্তার ওপর নয়, গলি-ঘুঁজির মধ্যে। গ্যালারীর ওপর তলা নিচের তলা ঘুরে এসে আবার বসলাম ম্যানেজারের সামনে। কথাবার্তা শুরু হল। "হামবুর্গ অ্যাকাডেমিতে দেখেছি, ছাত্রছাত্রীরা উগ্র মডার্ণ আর্টে উৎসাহ পাচ্ছে, আপনার গ্যালারীতে দেখছি সবই রিপ্রেজেন্টেশনাল ছবি; তো, আপনি কি মডার্ণ আরট সমর্থন করেন না? না কি মডার্ণ আর্টের খরিদ্দার নেই?"

"হামবুর্গ অ্যাকাডেমি একটা পাগলের আড্ডা, ওরা আর্টিস্ট নয়!"

"ডক্টর ভোগেলও পাগল?"

"পাগলের সর্দার!" তারপর ইঙ্গের দিকে ফিরে বললেন, "তুমি কি বলে ভদ্রলোককে ঐ উন্মাদাশ্রমে নিয়ে গিয়েছিলে?" কথা প্রসঙ্গে ফরাসী সমালোচক জঁা কাস্যুর নাম তুললাম, জঁা কাস্যুর নাম ম্যানেজার শোনেন নি, ছাত্রীদের জিজ্ঞেস করলেন, জঁা কাস্যু নামে কোনও ক্রিটিকের কথা তারা শুনেছে কিনা। না, তারাও শোনেনি। ভারতীয় আরট সম্বন্ধে কিছু জানার কোনও আগ্রহ

নেই ম্যানেজারের। কিন্তু মিউনিখের আর্টিস্ট রল্ফ্ লীজে কত উৎসাহই না দেখিয়েছিলেন ইণ্ডিয়ান আরট সম্বন্ধে এবং ইণ্ডিয়ান আর্টের মিউনিখে প্রদর্শনী করবার প্রস্তাব রেখেছেন। তন্ত্র আরটের কথা উঠতে ম্যানেজার আগাগোড়া বলে গেলেন 'মন্ত্র' আরট। আশ্চর্য, ভদ্রলোক আরট ডীলার, ঐ গ্যালারীটি খুব চালু, যেমন শুনেছি ইঙ্গের কাছে, কিন্তু হামবুর্গের বাইরের কোনও খোঁজখবর ম্যানেজার জানেন না, জানতে চানও না। "আমার গ্যালারী সম্বন্ধে আপনার কিছু জিজ্ঞাস্য আছে? ভারতে কি হচ্ছে, না হচ্ছে, তা নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না।" ইঙ্গের পরামর্শ, "এরকম প্রাইভেট আরট স্কুল আপনি দেশে গিয়ে চালু করুন!" বললাম, "এক আধটা নয়, ওরকম আরট স্কুল কয়েক শ আছে কলকাতায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে!"

হামবুর্গের অপেরায় যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু অপেরা সম্বন্ধে আমার তেমন কৌতূহল নেই, পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীতে ধাতস্থ হতে পারিনি। কথাবার্তা জার্মান ভাষায় হবে, তা আমার বোধগম্য নয়।

"কোনও সামাজিক সমাগমে যাবেন?"

"সেই ভাল।"

ইঙ্গেও সেইটেই চাইছিলেন, তাঁর এক ডাক্তার বান্ধবীর জন্মদিন, আমি অপেরায় যেতে চাইলে বেচারার নেমন্তন্নটা মাটি হত। হাতে যেন স্বর্গ পেলেন তিনি।

সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ টুকটুকে লাল ভক্সওয়াগন গাড়িতে ইঙ্গের পাশে বসে পৌঁছলাম এক মস্ত ফ্লাট বাড়ির সামনে। ইঙ্গে মহিলা হলে কি হবে, দ্রুত গাড়ি চালনায় কোনও পুরুষের থেকে কম নয়! বাড়িটি ছ'তলা। লিফট নেই। হামবুর্গের মত আধুনিক শহরের ছ'তলা বাড়িতে লিফট নেই, এ যেন ভাবাই যায় না। শুধু ঐ বাড়িই নয়, বহু বাড়িই আছে ও শহরে লিফট-বিহীন। হাঁপাতে হাঁপাতে ছ'তলায় উঠলাম। পরিচয় হল, ডাক্তার ভদ্রমহিলা এবং

তাঁর ইঞ্জিনীয়ার স্বামীর সঙ্গে। পার্টি তখন বেশ জমে উঠেছিল, আমার একটু লেট। ইঙ্গে খুব সেজেছেন। গলায় এখানকার মত লম্বা সীতাহার। হারটি তাঁর এক্স-হাসব্যাণ্ড মিস্টার পালাসিও ইজিপ্ট থেকে নিয়ে এসে এক সময় উপহার দেয়। ইঙ্গের পাশে আমাকে দেখে অতিথিদের কৌতূহল, হয়ত মনে করছেন তাঁরা আমি ইঙ্গের নতুন 'বন্ধু'। একজন মহিলা আমাকে জিজ্ঞেস করেই বসলেন, "ইঙ্গের সঙ্গে কত দিনের আলাপ আপনার ?" কৌতূহলটা অকারণ নয়, ইঙ্গে ডিভোর্স'ড! বললাম, "না সে রকম কিছু নয়, আমি এসেছি আপনাদের সরকারের অতিথি হয়ে ভারত থেকে ; ইঙ্গের ওপর ভার পড়েছে আমাকে হামবুর্গ দেখানর।"

হিড়িক পড়ে গেল ভারতীয় অতিথির সঙ্গে আলাপ করার। স্বামী-স্ত্রী, প্রণয়ী-প্রণয়ীনী সবারই হাতে সুরাপাত্র। হায়, আমি জার্মান ভাষা একবর্ণও জানি না! এক দম্পতি এগিয়ে এলেন, স্ত্রীটি ইংরাজী বলেন সামান্য, স্বামীও দু-চারটি ইংরাজী শব্দ জানেন। স্বামী জজ, স্ত্রী অ্যাটরনী। ইঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে সরে গেল আমার জন্যে, এবং নিজের জন্যেও, পানীয় সংগ্রহ করতে। অ্যাটরনী ভদ্রমহিলার প্রশ্ন, "আপনাদের দেশের মেয়েরা বয়সে ছোট পুরুষকে বিয়ে করে ?"

"খুব বেশী দেখা যায় না, তবে একেবারেই যে হয় না, তা নয়।"

"আমার স্বামী আমার থেকে চার বছরের ছোট, দেখে সেটা বুঝতে পারছেন ?" স্বামীটি মৃদু মৃদু হাসছেন। "না, একেবারেই বুঝতে পারিনি, বরং আপনার স্বামীকেই বয়সে বড় মনে হয়! বয়সে ছোট স্বামী নিয়ে আপনার কোনও দুশ্চিন্তা নেই ?"

"তা আবার নেই ? কত চেষ্টাই না করছি ওঁকে ধরে রাখতে। তিন বছর আমাদের বিয়ে হয়েছে, এরই মধ্যে দু-দুটি বাচ্চা।"

ইঙ্গে গ্লাস হাতে ফিরে এসে আমাকে প্রশ্ন করলেন, "আপনি

বিবাহিত ?” “নিশ্চয় ! আমার দুই পুত্র। একজনের বয়স ২৫, আরেক জনের ২০ !”

“আপনার দেশে ডিভোর্স হয় ?”

“ওতে আর বাহাদুরীর কি আছে ? আগে হত না বটে কিন্তু ইদানিং আধুনিক মহিলা দু-তিনবার স্বামী পালটেছেন, অসম্ভব কিছুই নয়। আগে হিন্দু বিবাহ প্রথায় ডিভোর্স নিষিদ্ধ ছিল। এখন খুব চলে।”

“সব বিয়েই কি ওখানে আনুষ্ঠানিক নিয়মে হয়ে থাকে ?”

“না, মডার্ণ-পন্থীরা সিভিল ম্যারেজে বিশ্বাসী।”

“আপনার কি নিয়মে বিবাহ হয়েছে ?”

“সিভিল !” “তাহলে আপনি মডার্ণ ?” “অবশ্যই !” অ্যাটরনী প্রশ্ন করলেন, “শুনেছি হিন্দু বিয়েতে অনেক নিয়ম কানুন, অনেক খরচ, তা সত্বেও সিভিল ম্যারেজ ওখানে জনপ্রিয় হচ্ছে না কেন ?”

“খরচ, বলে খরচ ! ভুরিভোজ আর সেই সঙ্গে যৌতুক ! ডিনারের যা মেনু, তা এদেশে পাত পিছু একশ মার্কেও সম্ভব হবে না। আর নিমন্ত্রিতের সংখ্যা ধরে রাখুন কম করেও হাজার। সিভিল ম্যারেজ জনপ্রিয় হচ্ছে না তার অনেক কারণ...” আমাদের কথাবার্তা কেটে দিলেন তীক্ষ্ণ মার্কিন উচ্চারণে ইংরাজী ছুরি চালিয়ে এক ভদ্রমহিলা। আমার মুখে ইংরাজী শব্দ শুনে তিনি আর থাকতে না পেরে এগিয়ে এসেছেন। ছোট ঝুলের স্কার্ট পরা পোশাক, মূলতঃ মার্কিন ওহিওর বাসিন্দা, জার্মানী এসে জার্মানের প্রেমে পড়ে বর্তমানে হামবুর্গে ঘর বেঁধেছেন উনি। সেরেছে ! আর তো গ্রামারে ভুল, ইডিয়ামের ভুল হলে চলবে না ! জার্মানের সঙ্গে বেশ চালিয়ে যাচ্ছিলাম, ওদের ইংরাজীর অবস্থা আমার থেকেও শোচনীয়। আশপাশে সেন্ট জেভিয়ারে বা লরেটোর শিক্ষাপ্রাপ্ত কেউ নেই যে ফরফরিয়ে ইংরাজী চালাতে না পারলেই বলবে, লোকটা একেবারে অশিক্ষিত ! মার্কিন মহিলা নানা প্রশ্ন তুললেন, আর্টের

সমালোচনা কি ভাবে হওয়া উচিত, সমকালীন আর্টে সত্যিই কি মূল্যবান কিছু সৃষ্টি হচ্ছে, ভারতের আর্টিস্টরা কোন পথে এগোচ্ছেন, ইত্যাদি। উত্তর দিয়ে মোটামুটি তাঁকে সন্তুষ্ট করতে পেরেছিলাম মনে হয়, একবাটি মাংসের স্যুপ এনে আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে ভদ্রমহিলা আবার আলোচনা শুরু করলেন। ইতিমধ্যে বুফে ডিনার শুরু হয়ে গেছে, অনেকে অবশ্য তখনও সুরা পান করেই চলেছেন। শ্যাম্পেনের ঘোর বেশ লেগেছে, সবার চোখই বুঝুঁ বুঝুঁ। একটি কৌচের এক কোণায় বসে আমি চামচ দিয়ে স্যুপ খাচ্ছি আর তামাসা দেখছি, মেঝের ওপর এক পুরুষ ও এক রমনী আধা শোওয়া অবস্থায়, ইঙ্গে আমার পাশে গা ঘেঁষে বসল। চুপি চুপি জিজ্ঞেস করল "আপনি কি ক্লান্তি বোধ করছেন?" বুঝলাম, কিছুক্ষণের মধ্যে যা কাণ্ড হতে চলেছে, সেখানে বিদেশী অতিথির উপস্থিতিটা উচিত নয়, ইঙ্গে আমাকে সরিয়ে দিতে চায়। অবিশ্রান্ত কথা বলেছি, তাও আবার মাতৃভাষায় নয়, সত্যিই আমার অবস্থা বেশ কাহিল! তখন প্রায় রাত্ একটা। পার্টি চলবে সারা রাত্রি! আমার পক্ষে হোটেলে ফিরে যাওয়াই মঙ্গল। টেলিফোনে ট্যাক্সি ডেকে দিয়ে, নিচে নেমে এসে ইঙ্গে গুডনাইট জানিয়ে ফিরে গেল পার্টিতে। এ ধরণের পার্টি অবশ্য কলকাতাতেও হয়ে থাকে, ইঙ্গ-বঙ্গ ভাষায় কথাবার্তা বলিয়ে পরিবারে ইদানিং খুব প্রচলিত। পরের দিন সকালে ইঙ্গের পক্ষে আমার সঙ্গে দেখা করার অবস্থা নিশ্চয় থাকবে না! দরকারও নেই, কারণ, সকাল ৭টার সময় আমাকে রওনা দিতে হবে ব্রেমেনের উদ্দেশে। ট্রেনে যাব। টিকিট হাতে পৌঁছে গেছে।

গুটি গুটি এগোলাম স্টেশনের দিকে। খোঁজ-খবর দপ্তরে জিগ্যেস করতে জবাব পেলাম, "অপেক্ষা করুন, গাড়ি আসবে এক্ষুনি।" গাড়ি এল! সামনে যে কমপার্টমেন্ট পেলাম তাতেই উঠে বসলাম। পুরো কামরায় যাত্রী সর্বসাকুল্যে ৬ জন। আমার

উল্টো দিকে বসেছেন এক স্থূলকায়া বয়স্কা মহিলা। চোখে মুখে বিরক্তি। বোধহয় আমি তাঁর সামনে বসেছি বলেই তিনি বিরক্ত। নিশ্চয় রঙীন মানুষে অ্যালারজির লক্ষণ! আমি জানলা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে চুপটি করে রইলাম। বেশীক্ষণ যন্ত্রণা ভোগ করতে হল না, পরের স্টেশনেই ভদ্রমহিলা নেমে গেলেন। হয়তো আমাকে সহ্য করতে পারলেন না বলেই নেমে গেলেন।

ইলেকট্রিক ট্রেন শহর পেরিয়ে চলল ক্ষেত খামারের পাশে পাশে। সাহেব চাষা কাজে ব্যস্ত, গরুর দল মাঠে ঘাস খায়। গরুগুলো অবশ্যই আমাদের গ্রামের গরুর মত হাড্ডিসার নয়, নধর চেহারা, সাদার ওপর বড় বড় কালো কিংবা বাদামি দাগ তাদের গায়ের রঙ। কুঁজ বিহীন। বেশ লাগছিল, দেশের গ্রামের রূপ দেখছিলাম কল্পনায়, আজ ঐ জার্মান গ্রামের সঙ্গে কোথায় তার সাদৃশ্য সেটাই মেলাচ্ছিলাম। ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই পৌঁছে গেলাম ব্রেমেন স্টেশনে। নেমে পড়লাম। কিন্তু কেউ তো আসেনি আমাকে রিসিভ করতে। কী হবে? আবার ফিরে যাব হামবুর্গে? দেখতে দেখতে প্লাটফরম ফাঁকা হয়ে গেল। স্টেশনের বাইরে বেরিয়ে একবার দেখব? এক ছোট্টখাট্ট মহিলা ছুটতে ছুটতে আসছেন আমার দিকেই। "আপনিই তো মিস্টার মালিক না? আমি খুঁজে মরছি আপনাকে ট্রেনের শেষের দিকে ফার্স্ট ক্লাস কামরায়। যাক্ বাবা, বাঁচলাম।" ভদ্রমহিলার নাম গুডরুন ফন ভিভিস। শ্রীমতী এক ব্যারোনেস। স্টেশন এলাকা পেরিয়ে, রাস্তা ডিঙ্গিয়ে এক হোটেলে পৌঁছলাম। লাউঞ্জে বসে কফি পান করতে করতে ব্যারোনেসের সঙ্গে আলোচনা হল কিভাবে সফর শুরু হবে। প্রথমে শহরটা সম্বন্ধে একটা আইডিয়া করে নেওয়া দরকার।

ব্রেমেনকে শুধু শহর বললে ব্রেমেনবাসীরা ক্ষুণ্ণ হন। ব্রেমেন পশ্চিম জার্মানীর একটি রাজ্য। হামবুর্গ শহরও রাজ্য। তবে

হামবুর্গ অপেক্ষা ব্রেমেনের আয়তন অনেক ছোট, লোক সংখ্যাও কম। এটি জার্মানীর এক অতি পুরাতন বন্দর। বাড়িঘরগুলো দেখতে বেশ সেকেলে, একালের স্থাপত্যকলা একেবারে নেই বললে মিথ্যে বলা হবে, তা হলেও ব্রেমেনের একেকটা অঞ্চল এমন আছে যেখানে প্রবেশ করলে মনে হবে যেন কয়েক'শ বছর পিছিয়ে গেছি। সব বাড়িরই ছাদ লাল টালির তৈরী, তুপাশ থেকে ঢালু আর সামনের জানালা-দরজা, কার্নিস ইত্যাদি মিলে বড বেরঙে ওদেশের সাবেকী রূপ। বাড়িগুলো পাঁচ-ছ তলার বেশী হবে না, তবে আশেপাশের গীর্জা যেন আকাশ ছুঁয়ে যায়। মস্ত মস্ত গীর্জা। সরু সরু গলি, কতকটা আমাদের কাশীধামের মত। চারতলা কিংবা তিনতলার বাসিন্দা কেউ ভাবছেন গলির ওপারের বাড়ি যাওয়া দরকার, তাঁকে একতলায় নেমে এসে এপার ওপার করতে হবে না,—চার তলাতেই সাঁকো আছে এবাড়ি ও বাড়ির মধ্যে। গলির তুপাশে দোকান। দোকানিদের খরিদ্দার আহ্বান করার ঢং-ও আমাদের দেশেরই মতো, শুধু ওদের চেহারাটাই আলাদা, গায়ের রং ফর্সা, মাথার চুল কটা, আর পুরুষ কোট প্যান্টুল পরা। স্ত্রীলোকদের ফ্রক আর গায়ে কেউ বা কোট চাপিয়েছে, কেউ বা সোয়েটার। কোনও কোনও গলির মধ্যে গাড়ি ঢুকতে পারে, আবার কোনওটি এতই সংকীর্ণ যে পাশাপাশি তুজন হাঁটাও অসুবিধের। হাঁটতে হাঁটতে শ্রীমতী ভিভিসের গায়ে ধাক্কা খাচ্ছি। প্রবেশ করলাম একটা সাবেকী গৃহে। গৃহটি এককালে ছিল জনৈক রহিমের, বর্তমানে তা মিউজিয়ামে পরিণত হয়েছে। নানা আসবাবে ঘর সজ্জিত, কিন্তু সব সাবেকী আমলের। দেয়ালে ছবি, তাও প্রাচীন, নিশ্চিত কোনও বিখ্যাত শিল্পীর মাস্টারপিস নয়, স্থানীয় কলাকারের বাহাতুরী। শ্রীমতী ভিভিস বললেন, "আমি ভারতে গেছি তু' তু-বার। খুব ভাল লাগে! ভারতীয়রা অতিথি বৎসল, কত ভদ্র! জানেন, ভারতের কোনও শহরে একা ঘুরে বেড়াতে আমার একটুও ভয় করত না। কিন্তু এখানে অসভ্য

বেয়াড়া লোক যেখানে যাব সেখানেই, খুব সাবধানে ঘোরা ফেরা করতে হয় মেয়েদের।" এই দেশেই আছে, 'সেক্সোরামা' এই দেশেই নিউডিস্টদের আড্ডা, এই দেশেই হয় স্ট্রিপটিজ শো, আবার এই দেশেরই মেয়ের মুখে শুনি 'বদ' লোকের ভয়ে সাবধানে ঘোরাফেরা করতে হয় মেয়েদের। তাজ্জব কি বাত!

একটি চার্চের অভ্যন্তর। ওপর দিকে তাকালে মাথা ঘুরে যায়। "দুটি মানুষের আত্মা ধরা পড়ে আছে এই চার্চের মধ্যে, তারা এক দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছিল।" ভূত বিশ্বাস করি না, তা হলেও ভাবলাম কি দরকার এ চার্চে বেশীক্ষণ কাটাবার। আত্মারা নাকি প্রায়শই দেখা দেন। চার্চের সামনে পাশে গলি নয়, প্রশস্ত রাস্তা, ট্রাম-বাসের রুট। ফুটপাথে মস্ত ফুলের বাজার, কি বাহার, কি বাহার! ইচ্ছে করে গোটা বাজারটাই খরিদ করে নিই!

চীনা রান্নার প্রশংসা সারা পৃথিবীতেই। ইউরোপের সব বড়বড় শহরেই চীনা রেস্তোরাঁর হদিশ মেলে। ব্রেমেন বড় শহরের মধ্যে অবশ্যই পড়ে না, কিন্তু চীনা রেস্তোরাঁ এ শহরেও আছে। শ্রীমতী ভিভিস ধরে নিয়েছেন, আমি চীনা ডিসই পছন্দ করব, সোজা আমাকে সঙ্গে নিয়ে ঢুকলেন এসে ম্যাণ্ডারীন অক্ষরে লেখা সাইন-বোর্ড, এক ভোজনালয়ে। বেঁটে খাটো, নাক থেঁদা, চোখ সরু, পীতবর্ণ সোজা সোজা কালো চুলে মাথা ভরতি, কোন্ দেশের মানুষ বুঝতে ভুল হয় না, রেস্তোরাঁ মালিক বিনয়ের অবতার, আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়ে বসালেন নিরিবিলি এক টেবলে। চীনা ভদ্রলোক মনে করছেন, ভিভিস ও আমি ঘনিষ্ঠ জুটি! মিনিট দশেকের মধ্যে বড় বড় প্লেট ভরতি আহার্য এল সামনে। "এত খাবার কি হবে?" "যতটা পারবেন খাবেন, বাকিটা ফেলা যাবে!" ফেলা যাওয়া খাবার নাকি শূকরকে খাওয়ান হয়। গুডরুণের মতে এ খাবার পরের খরিদ্দারদের দিলেই বা ক্ষতি কি? ঘাঁটাঘাঁটি তো করা হয়নি, কাঁটা চামচ দিয়ে তুলে নিয়ে অন্য প্লেটে খাওয়া

হয়েছে। আসল রীতিটা, আমার বিশ্বাস, সেটাই!

বেশ মোটাসোটা বিল মিটিয়ে, গুডরুণ বললেন, অনেক কিছুই দেখা বাকি। হু হু করে ট্যাক্সি ছুটল। মাইলের পর মাইল পার হয়ে যায়, কোথায় চলেছি কোন ধারণা নেই আমার। রাস্তার দুপাশে একতলা দোতলা বাড়ি। গুডরুণ পাশে বসে ব্রেমেনের ইতিহাস বলে চলেছেন!

গাড়ি এসে থামল ওয়ার্পসোয়েডে! ওয়ার্পসোয়েড একটি গ্রাম। শ্রীমতী ভিভিস আমাকে এখানে টেনে নিয়ে এসেছেন কারণ, শিল্পরসিক-দের কৌতূহলোদ্দীপক দুটি জায়গা আছে এখানে; একটি সমকালীন শিল্পীদের ওয়ার্কশপ আর অন্যটি এক শিল্প-সংরক্ষণাগার।

স্বপ্নময় আর শান্ত এই গ্রামটি কতকাল এমন থাকবে বলা কঠিন, শহুরে জীবনযাত্রার অনুপ্রবেশ এখানেও বাধা পায় নি। বিদ্যুৎ ব্যবহার তো আছেই সেই সঙ্গে, সব রকম আধুনিক সাজসরঞ্জাম ক্রমশই জনপ্রিয় হয়ে উঠছে বাসিন্দাদের মধ্যে। অবশ্য ঘরবাড়ির ভিতরে যতই আধুনিক থাকুক না কেন, ওয়ার্পসোয়েডের ল্যাণ্ডস্কেপে সেই গ্রামই থেকে গেছে। এক কালে কিছু উৎসাহী শিল্পী ওয়ার্প-সোয়েডের এক খামারে তাদের প্লেন-এয়ার পেইন্টিং-এর প্রদর্শনী করেন। সেই থেকেই গ্রামের নাম আর্টিস্ট মহলে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। ঐ শিল্পীবৃন্দেরই বুদ্ধিতে ওয়ার্কশপ গড়ে উঠল। ওয়ার্কশপের চেহারায় কিন্তু গ্রাম্য কিছুই নেই, না ভেতরে না বাইরে; বার্লিন, কিংবা মিউনিখ, কিংবা হামবুর্গের মত বড় শহরে দেখতে পেলে আশ্চর্য হতাম না। যা হোক, বর্তমানে স্থানটি আন্তর্জাতিক আর্টিস্টদের দৌলতে পৃথিবী বিখ্যাত। এখানে দেশ বিদেশ থেকে শিল্পীরা আসেন এবং কাজ করেন, প্রদর্শনী করেন। কনসার্ট হয়, লেকচার হয়, নাচ-গান হয়, সিনেমা হয়—নানান হৈ হল্লা। যা ছবি, ভাস্কর্য, আর সিরামিক্স দেখলাম তাতে গ্রাম্য মেজাজ আদৌ প্রকাশ পায় না, যদিও গ্রামের অনেক বিষয়ই

উপস্থাপিত। গ্রাম্য হাবভাব গ্রামবাসীদের আর নেই, বাইরের থেকে আসা লোকজনের প্রভাবে তারা রীতিমত শহুরে। যেমন আমাদের দেশেও দেখা যায়, ও গ্রামবাসীর মন এখন শহরের দিকে, কলকারখানায় কাজ করবে, শহুরে জীবন উপভোগ করবে, থাক পড়ে চাষ-আবাদ থাক পড়ে গরু-বাছুর! শীতের সময় সারা গ্রাম ঢাকা পড়ে বরফের আচ্ছাদনে, স্কী খেলোয়াড় আর স্কেটারদের তখন স্বর্গ ওয়ার্পসোয়েড গ্রাম। কিন্তু ওয়ার্পসোয়েডের আমি যে চেহারা দেখে এসেছি তার সঙ্গে ভারতের অনেক পাড়াগাঁর নৈসর্গিক রূপ দিব্যি মিলিয়ে দেওয়া যায়। আমাদের বাংলাদেশের মতই জলা, ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক, কাদা আর নীল আকাশে খণ্ড খণ্ড সাদা মেঘ!

পাকা রাস্তা ছেড়ে ট্যাক্সি নেমে গেল পাশের কাঁচা রাস্তায়। কিছু তফাৎ নেই ভারতীয় দেহাতি সড়কের সঙ্গে, জায়গায় জায়গায় কাদা, গাড়ি এঁকে বেঁকে চলেছে, মাঝে মাঝেই চাকা পড়ছে গর্তে। ট্যাক্সি চালক মহিলা, পাশে শ্রীমতী ভিভিস, আমিই একমাত্র পুরুষ, আশে পাশে কোনও মানুষ দেখা যায় না! যদি গাড়ি কাদায় ফেঁসে গিয়ে নট নড়নচড়ন হয়ে পড়ে, আমাকেই নামতে হবে ঠেলতে। আমার একার পক্ষে ঐ গাড়ি নড়ান সম্ভব? ড্রাইভার মুচকি হেসে আশ্বস্ত করল, গাড়ি ফেঁসে যাবার কোনও সম্ভাবনা নেই। সত্যিই কোনও বাধা না মেনে দিব্যি গাড়িটি হেলেদুলে এগুতে লাগল। এসে পৌঁছলাম পুরান আমলের এক বাংলো বাড়ির সামনে। মস্ত বাংলো, খড়ের চাল। একটু তফাতে তফাতে ঘোড়ার আস্তাবল; কোনও জীবন্ত ঘোড়া দেখতে পেলাম না; একটি ঘোড়ায় টানা সাবেকী মালবাহী গাড়ি সামনে দাঁড়িয়ে। এ দেশে বলদ দিয়ে যে কাজ করান হয় ওদেশে সে কাজ করতো এক সময় ঘোড়া। আস্তাবলের সংলগ্ন এক গোলাবাড়ি। আমাকে আঠার শতকের গ্রাম-ইউরোপে ফিরিয়ে নিয়ে গেছেন শ্রীমতী ভিভিস! ঐ বাংলো,

গোলাবাড়ি, আস্তাবল আর আশেপাশের জমির মালিক ছিলেন এক শিল্পী। রুজি রোজগার হত তাঁর চাষ আবাদে, ছবি আঁকাটা ছিল সখের। শিল্পীর জীবদ্দশায় যেমন ভাবে বাড়িটি গোছান সাজান থাকত, আজও তেমনই আছে। বর্তমানে ও বাড়ি সরকারের তত্ত্বাবধানে। শ্রীমতী ভিভিস বললেন, "মাস খানেক আগে আমি এখানে এসেছিলাম লর্ড মেয়র অব ওয়েলিংটনকে নিয়ে, তার পরেই এলাম আপনাকে দেখাতে।"

বাংলোর ভেতরে ছিম্‌ছাম্‌ বসার ঘর, শোবার ঘর, অতিথির ঘর, খাবার ঘর ইত্যাদি। আসবাবপত্র সব সে-যুগের। মধ্যে মধ্যে আলকাতরা মাখান মোটা মোটা খুঁটি দিয়ে ছাদ ধরে রাখা। মেঝে কাষ্ঠ-তক্তার। ড্রয়িং রুমে অনেক ছবি আর কিউরিও। অদ্ভুত এক মেজাজ। "সত্যিই, আপনি কিছু দেখালেন বটে আজ আমাকে!" ভিভিস খুব খুশী! ঘরে টাঙান একটি হাওয়া কলের ছবির দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে শ্রীমতী বললেন, "আপনাকে আসল হাওয়া কলটি চলুন দেখাচ্ছি!" কিসে আমি আকর্ষণ বোধ করি শ্রীমতী তা ধরে ফেলেছেন। আবার কাদা ঠেলে ট্যাক্সি এগোতে থাকল। হাওয়া-কলের পাশে। নামতে হল গাড়ি থেকে। হাওয়া লাগলে এখনও পাখা ঘোরে; কিন্তু ও কলে আর গম পেশাই হয় না। ওটি আজ পরিত্যক্ত! সেকালের সাক্ষী হয়ে আছে দাঁড়িয়ে। কত হাওয়া লেগেছে ও পাখায় কে হিসেব দেবে? সামনের ধু ধু মাঠ আর পুরু মাটির আল, "ইউরোপের গ্রাম আর ভারতের গ্রামের মধ্যে তফাৎ তো খুব একটা দেখছি না!" "হ্যাঁ, আমারও এই কথাই মনে হয়েছিল যখন আমি ভারতে গিয়েছিলাম।" এবার ফেরার পালা, কখনও সর্পিল কখনও ঋজু পিচ রাস্তা দিয়ে এগোচ্ছি, দুপাশে ক্ষেত। বাঁ পাশের ক্ষেতের পরে রেল লাইন। খুব ছোট্ট রেল স্টেশন ওয়ার্পসোয়েড। সারা দিনে ঐ স্টেশনে কটাই বা টিকিট বিক্রি হয়! কিন্তু ব্যবস্থা আছে সব, শৌচাগার, ওয়েটিং রুম,

মাস্টারমশাইয়ের দপ্তর—সব। কিছুদূর অন্তর অন্তর সাহেব চাষী-দের বাসগৃহ, ভারতীয় চাষীভাইদের কুঁড়েঘরের মত অবশ্যই নয়। লক্ষ্য পড়ছে মাঝে মাঝেই বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে সার তৈরী হচ্ছে, প্লাস্টিকের চাদর দিয়ে সার রয়েছে ঢাকা, তার ওপর মোটর গাড়ির অজস্র টায়ার চাপা। ভিভিস আর ড্রাইভারের মধ্যে কি আলোচনা হল বোধগম্য হল না, গাড়ি বাঁক নিয়ে পড়ল কাঁচা রাস্তায়। এবার এক চার্চের সামনে! কিন্তু ব্রেমেনে যে গীর্জা দেখে এসেছি, এ চার্চ আদৌ সেরকম নয়। সাদা চুনকাম করা পুরু পুরু দেয়াল, গঠন দেখলে আন্দাজ হয় মাটি জমান। ভেতরে গুটি কয়েক বেঞ্চি, ২০/২৫ জনের বসার ব্যবস্থা। পাদরি সাহেবের আসনের পিছনে মস্ত ছবি, ক্রুশবিদ্ধ যীশু। গীর্জার এক পাশে সার সার কবর। কারা ঐ কবরের নিচে শুয়ে আছেন কে জানে? নিশ্চয় ঐ গ্রামেরই এক সময়ের গণ্যমান্য তাঁরা। গোরস্থানের চারপাশে সুন্দর ফুলবাগিচা। ভিভিস কবরের দিকে চেয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলেন কিছুক্ষণ। অশরীরীরা আশেপাশে ঘোরা ফেরা করেন কিনা শুনিনি, তবে ওখানকার আবহাওয়া তাঁদের যে মনের মতন, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। অতবড় গীর্জা, অতবড় বাগান, অতগুলো কবর, কিন্তু পাশে ভিভিস ছাড়া আর একটাও জীবন্ত মানুষ চোখে পড়ল না। জীবনের সাড়া পড়ে ওখানে কেবল রবিবার সকালে।

আমার জন্যে হামবুর্গ-ব্রেমেন যে রিটার্ণ টিকিট কেটে দেওয়া হয়েছিল সেটা ফার্স্ট ক্লাসের। বোকার মত আমি সেকেণ্ড ক্লাসে উঠে বসেছিলাম আসার সময়। ফার্স্ট ক্লাসে এলে সেই স্থূলকায়া স্ত্রীলোকটির সামনে বসতে হত না আমাকে। গতস্য শোচনা নাস্তি! ভিভিস আমার টিকিটটা দেখতে চাইলেন, "এটা ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট, এই যে এই কামরায় আপনাকে উঠতে হবে।" তারপর বেশ কিছুক্ষণ আমার হাত নিজের হাতের মধ্যে চেপে ধরে

রেখে, 'ভারতে দেখা হবে' জানিয়ে পিছন ফিরলেন। সময় মত ট্রেন ছেড়ে দিল।

যখন হামবুর্গে, তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। কথা ছিল ফিরে এসে ইঙ্গেকে টেলিফোন করব, কিন্তু ইঙ্গের যা পালাই-পালাই ভাব, ইচ্ছে করেই টেলিফোন করলাম না। স্টেশনের স্টল থেকে এক হামবুর্গার আর ইয়া বড় পেষ্ট্রী খেয়ে দিব্যি ডিনার হয়ে গেল। হামবুর্গ গিয়ে হামবুর্গারের স্বাদ গ্রহণ করব না, সেটা কেমন কথা! হোটেল আটলান্টিকের ঘরের জানালা দিয়ে রাতের আলোয় আলোকময় শহরের দৃশ্য উপভোগ করার মতই বটে! ঘরের মধ্যে মিনি বার, ওয়াইন, বিয়ার, হুইস্কী, স্ন্যাক্স, মিনেরাল ওয়াটার ইত্যাদি ঠাসা। দরকার পড়লে মিনি বার খোলা যেতে পারে, কেউ আপত্তি করবে না। বাইরে কনকনে শীত ভিতরে উত্তাপ। আমার ও হোটেলে শেষ রজনী। পরের দিন থেকে আর ইন্টার নাশিওনের অতিথি থাকছি না; আরও কিছুদিন হামবুর্গে কাটাতে হলে আটলান্টিক ত্যাগ করে অন্য কোথাও আশ্রয় নিতে হবে। কুছ পরোয়া নেই, ভাগ্নীকে টেলিফোন করলাম, সকালেই যেন চন্দ্রশেখর চলে আসে। শেষবারের মত হোটেলের বাথটবে ঠাণ্ডা জল, গরম জল মিশিয়ে, তরল সাবান গুলে নিয়ে ঘন্টাখানেক শরীরটাকে ডুবিয়ে রাখলাম। গা মুছে একেবারে সোজা বিছানায়। কিন্তু অত করেও ভালো ঘুম হল না, থেকে থেকেই নিদ্রাভঙ্গ! সারারাত্রি ঐ ভাবেই গেল কেটে! পরের দিন ভোরে ছটা বাজতে না বাজতেই দ্বারে টোকা, চন্দ্রশেখর এসে গেছে! রেডি হয়েই ছিলাম, এক মুহূর্তও দেরী না করে নেমে গেলাম নিচে। হোটেলের পাওনা মেটাবেন ইঙ্গে বেলায় এসে!

দেখা হল শ্রী চক্রবর্তীর সঙ্গে। ইনি কলকাতার প্রখ্যাত শিল্পী পূর্ণ চক্রবর্তী মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র। কমপিউটার এক্সপার্ট। এক জার্মান মহিলার পাণিগ্রহণ করে পাকাপাকি ভাবে ঘর বেঁধেছেন

হ্যামবুর্গে। বললেন, "এই যে ফিশ মারকেট দেখছেন এরই চেহারা রাত্রে বদলে গিয়ে হবে অন্যরকম। কেবল সেক্স; সেক্স ছাড়া এরা আর কিছু বোঝে না। চলবে শুধু মাতলামি আর সেক্সানন্দ।" ও দেখায় আমার তেমন কৌতূহল নেই, বাঙ্গালীর ছেলে মৎস্য যেমন খাইতে ভালোবাসি তেমন দেখিতেও ভালোবাসি। অজস্র মেছোরা মাছ বিক্রি করতে বসেছে জাহাজ ঘাটের ধারে। চোখ যেন জুড়িয়ে যায়। কত রকম মাছ। বেশ কিছুর চেহারা আমাদের দেশী মাছের মত, আবার অনেক আছে যা জীবনে কখনও দেখিনি। মাথা কাটা চিংড়ির খুব চাহিদা। ফিস মার্কেটে দর সস্তা। আমাদের দেশেও অত সস্তায় মাছ পাওয়া যায় না। শুধুই কি মাছ? সঙ্গে বসেছে ফুলওয়ালা, ফলওয়ালা, সব্জীওয়ালা, মালা-ওয়ালা, এমনকি ছবিওয়ালাও। কতকটা এদেশের হাটের মতই, তফাৎ শুধু ওদের চেহারায় আর সাজ-সরঞ্জামে। ওরা সবাই মোটর-গাড়ির মালিক। কেউ পোরটেবল মেজ খাটিয়ে নিয়েছে, কেউ বা স্টেশন ওয়াগন কিংবা ভ্যানের ভেতর বসেই ব্যবসা চালিয়েছে। সে কি চিৎকার! নিলাম হচ্ছে এক থোলো আঙুর, ৫ মার্ক, ৪ মার্ক, ৩ মার্ক, ২, শেষে দেড় মার্কে বিক্রি হয়ে গেল প্রায় দু কেজির মত ফল, অর্থাৎ মাত্র ৬ টাকায় দু কেজি আঙ্গুর নিয়ে বাড়ি ফিরল ক্রেতা। ভাবা যায়? এক ডজন আপেলের দর হাঁকা চলেছে, খরিদ্দার জুটলো না, দোকানদার ছুড়ে ফেলে দিল আপেলগুলো সামনে জমায়েত জনতার মধ্যে। পাশের দোকানির সঙ্গে তর্কাতর্কি আর মুখ ভ্যাঙ্গানি, দৃশ্য বটে! ঘাটে মাছধরা ট্রলার এসে লেগেছে, ট্রলার থেকেই বিক্রি হচ্ছে পণ্য, খরিদ্দার ডেঙায়। বেলা নটা পর্যন্ত থাকবে এই বাজার, নটার পর এক মুহূর্তও নয়, পুলিশ নজর রাখছে ঘড়ির দিকে।

বাঙ্গালীর দেখা মিলতেই আমার মুখে বিদেশী শব্দ উচ্চারণ একেবারে থেমে গেছে। অনর্গল বাংলায় কথা বলে চলেছি।

'নানান দেশের নানান ভাষা, বিনে স্বদেশীয় ভাষা পুরে কী আশা ?'
ধন্য কবি! সত্যটা বুঝেছি বিদেশে গিয়ে। ভাগ্নীর ডেরায় মাছের ঝোল আর ভাত, সে কি স্বাদ! আহারান্তে বাংলা স্টাইলে নাক ডাকিয়ে লম্বা ঘুম। তবে স্নান-শৌচাগার সেই হোটেলের মতই। প্রাতঃকৃত্যাদির অসুবিধে থেকেই গেল। যস্মিন দেশে যদাচারঃ। ব্যাপারটা মেনে নিতেই হবে। স্নানের সময় ভালো করে পরিষ্কার হওয়া ছাড়া গতি নেই। টয়লেট পেপার ব্যবহার করায় অস্বস্তি কাটে না।

একদা নাৎসী ইউ-বোটের ঘাঁটি কীল আম অতি শান্ত এক বন্দর। অলিম্পিকের সময় সমস্ত জলক্রীড়ার আঙ্গিনা ছিল কীলের বলটিক খাল। আর, প্রত্যেক গ্রীষ্মকালেই এখানে হয় আন্তর্জাতিক বাইচ প্রতিযোগীতা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে এই কীল থেকেই শয়ে শয়ে ইউ-বোট পাড়ি দিয়ে ছড়িয়ে পড়ে সাত সমুদ্রে। কত যে তারা জাহাজ ডুবিয়েছে তার হিসেব একমাত্র জার্মান নৌ-বাহিনীর খাতাতেই আছে। কীলের পাশে লুবেক। আকাশচুম্বী লুবেক টাওয়ার থেকে লক্ষ্য রাখা হত কোনও জাহাজের গতিবিধি সন্দেহজনক কিনা। টাওয়ারের টেলিস্কোপ দিয়ে দেখবার চেষ্টা করলাম দুষমন রণতরী। কিন্তু কোথায় তরী ? শুধু ঢেউ! নীল সমুদ্রের ঢেউ বলটিক উপসাগর। টাওয়ারের নিচের তলায় মাটির নিচে চিরশায়িত নৌযুদ্ধের বলি বড় বড় বীরেরা। কেউ বা ছিলেন অ্যাডমিরাল কেউ বা ভাইস অ্যাডমিরাল, কেউ বা ক্যাপটেন। কত ঘটনাই না ঘটেছে তাঁদের জীবনে। মৃতদের শ্রদ্ধা জানিয়ে উৎসর্গ করে রেখে গেছে বাগান-মালা আত্মীয়, বন্ধু আর গুণগ্রাহীরা। টাওয়ার সংলগ্ন আছে এক কৌতূহলোদ্দীপক মিউজিয়াম। এ মিউজিয়ামে নেই পেইন্টিং, নেই ভাস্কর্য, আছে শুধু ছোটবড় নানান জাহাজের মডেল। যুদ্ধে সলিল-সমাধিস্থ হয়েছে যে সব জার্মান নামকরা রণপোত, মডেলগুলি সেই সব জাহাজের। জাহাজ সম্বন্ধে লেখকের

জ্ঞান খুবই দরিদ্র, কিন্তু ও-মিউজিয়ামে দর্শক আসেন দেশ-দেশান্তর থেকে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটে তাঁদের একেকটি মডেলের সামনে। কীল আর লুবেক হামবুর্গ শহরের খুব কাছে, এক ঘণ্টারও পথ নয়, অবশ্য অটোবান ধরে গাড়ি ছোটে ঘণ্টায় ১৫০ কিলোমিটার বেগে। ইংরাজীতে যার নাম হাইওয়ে জার্মানে তা অটোবান।

কিছু কেনাকাটা করে, আর শহর দেখে কেটে গেল তিন চারটে দিন। ইঙ্গে টেলিফোনে খোঁজ নিয়েছেন, গেছি না আছি। ইঙ্গে অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট করে রেখেছিলেন এক শিশু-চিত্রাঙ্কন শিক্ষায়তনের অধ্যক্ষের সঙ্গে। দেখা করা হয়নি। আমার কাছে বেশী গুরুত্বপূর্ণ বি, এল, এন ভিসা জোগাড় করা। অধ্যক্ষের সঙ্গে দেখা করতে গেলে ওটা আর হত না।

বেলজিয়াম, লুক্সেমবুর্গ আর নেদারল্যাণ্ড—সংক্ষেপে বি, এল, এন। স্থলপথে যেভাবেই যাওয়া হোক পারী পৌঁছতে হলে ঐ তিনটি দেশের মধ্যে দিয়ে যেতে হবেই, আর যদি ভিসা না থাকে তাহলে সীমানা থেকেই বিদায়, চন্দ্রশেখর সতর্ক করে দিয়েছিল। রাত দুটোর সময় শীতের মধ্যে কাঁপতে কাঁপতে পৌঁছলাম স্টেশনে। রাত্রের হামবুর্গ স্টেশনের সঙ্গে হাওড়ার খুব একটা পার্থক্য নেই। বেঞ্চি-গুলোর ওপর, প্লাটফরমের মেঝেতেও মেয়ে-পুরুষ গড়া গড়া নিদ্রিত, কেউ বিছানা পেতেছে, কারোর আবার তা জোটেনি। ছেঁড়া খাবারের প্যাকেট, খালি বিয়ার ক্যান প্লাটফরমে ছড়িয়ে ছিটিয়ে এদিকে সেদিকে কিছু কম নেই। বেলা বাড়লে সব পরিষ্কার হবে। আমাদের দেশে বেলা বাড়লেও পরিষ্কার হয় না, ঐটুকুই তফাৎ। প্যারিসগামী গাড়ি তখনও স্টেশনে লাগেনি। চারপাশের দৃশ্য দেখে মনে হয় নিয়মকানুন দিয়ে বেঁধে না রাখলে সব দেশের মানুষেরই প্রকৃতি এক।

গাড়ি ছাড়ল কাঁটায় কাঁটায় আড়াইটার সময়। রেলগাড়ির টিকিট কাটার উদ্দেশ্য ছিল ইউরোপের দৃশ্য দেখতে দেখতে যাব,

কিন্তু কি দেখব? জানালার বাইরে সব তো অন্ধকার। ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুম ভাঙতেই দেখি দুটি পুরুষ আর একটি মহিলা, সকলেই কৃষ্ণবর্ণের পোশাকে সজ্জিত; একজন আমার দিকে হাত বাড়িয়ে রয়েছেন, ভিসা দেখতে চাইছেন, অর্থাৎ পশ্চিম জার্মানীর সীমানা পেরিয়ে এসেছি। যদি ভিসা না থাকতো, কী কেলেঙ্কারীটাই না হত!

সকাল হতে না হতেই আমার কামরা ভরতি হয়ে গেছে, সহযাত্রীদের মধ্যে কেউ ফরাসী, কেউ জার্মান, একটি মার্কিন দম্পতিও আছেন। ফরাসী রাজ্যের মধ্যে প্রথম স্টেশন আসতেই ঘড়র ঘড়র শব্দে এক ঠেলাগাড়ির আগমন কমপার্টমেন্টের প্যাসেজে। ঠেলা-গাড়ি বোঝাই প্রাতঃকালীন খাদ্য। ফরাসী ছোকরা ভেণ্ডার বলছে, "সব চলবে, জার্মান মার্ক, ফরাসী ফ্রাঁক, আমেরিকান ডলার, সব। গরম গরম খাবার!" খুব খিদে পেয়েছিল, গোটা সারেক স্যাণ্ডুইচ আর একটা কেক খেয়ে পেট ভরালাম। সাড়ে বারোটা নাগাদ পৌঁছব প্যারী। তার মধ্যে আর খিদে পাবে না নিশ্চয়!

কিছুদিন আগে ভাগ্নী এসেছিল হামবুর্গ থেকে কলকাতায়; বলল, "মামা, তোমার সেই জার্মান বান্ধবী ইঙ্গে বার্থ দ পালাসিও না কি, হঠাৎ এসে হাজির আমার অ্যাপার্টমেন্টে। কোত্থেকে একটা বেনারসী শাড়ি কিনে এনেছে, তাকে পরিয়ে দিতে হবে। শাড়ি পরে বলল—চললাম স্পেনে, বিশ্বকাপ ফুটবল দেখতে।" শাড়ি পরে বসে ইঙ্গে ফুটবল খেলা দেখলেন। আর ভারতীয় মেয়েরা ব্লু-জীন পরে দেখে ক্রিকেট খেলা। দুনিয়াটা বুঝি পাল্টে যায়!

# কলাতীর্থ পারী

পারী পৌঁছেই অঞ্জুর খোঁজ করেছিলাম। কলকাতার আরট কলেজ থেকে পাশ করা অঞ্জু চৌধুরী বর্তমানে অঞ্জু চৌধুরী হুফ্ৰ্যান। কিন্তু তার না জানি ঠিকানা, না জানি টেলিফোন নম্বর। ঠিকানা জানলেও আমার পক্ষে একা সেখানে উপস্থিত হওয়া অসম্ভব ; পারীর রাস্তাঘাট আমার কাছে গোলকধাঁধা। চারদিন কেটে গেছে, এর মধ্যে একদিন শক্তি বর্মন ধরে নিয়ে গিয়ে একটা সমকালীন আরটের প্রদর্শনী দেখিয়েছে ; সে প্রদর্শনীতে শক্তিরও ছবি ছিল। বুঝলাম, আমাকে ওখানে নিয়ে যাওয়ার প্রধান কারণ ওটাই। পারীর ঐতিহাসিক ভরসেই রাজপ্রাসাদের ওরাঞ্জরী—অর্থাৎ, যেখানে একসময়ে রাজভবনের আবাসিকদের জন্যে কমলালেবু মজুত থাকত,

সেই ঘরে ঐ প্রদর্শনীর উদ্বোধন উপলক্ষে স্ন্যাক্স আর শ্যাম্পেন যে যত পার উদরস্থ কর! শক্তি কথাটা মনে রাখতে পারনি, তাকে বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও সে অঞ্জুকে আমার পারী আগমন সংবাদ দেয়নি—নিশ্চিত শঁাপাইনেরই প্রভাব। তার মনে পড়েছে চারদিন পর।

অঞ্জুর বাড়ি চুনোমাছের ঝাল আর ভাতের নিমন্ত্রণ পেয়ে মনটা নেচে উঠল। চুনোমাছের ঝাল? পারীতে বসে? কথাটা বিশ্বাস করতেই পারছিলাম না। ইউরোপে ক'দিন ধরে নানান রকম ডেলিকেসির স্বাদ গ্রহণ করতে করতে অরুচি এসে গেছে, খেতে বসে সব সময়েই কলকাতার ডেলিকেসির কথা মনে পড়ছে, সুক্তানি, লাউ-চিংড়ি, ডাঁটা চচ্চড়ি—আহা কী লোভনীয়! অদিতির আতিথেয়তার ত্রুটি নেই, কোনও দিন খিচুড়ি, কোনও দিন দেশি কায়দার মাংসর ঝোলের সঙ্গে ভাত, কিন্তু চুনো মাছের ঝাল তার মাথায় আসেনি।

অদিতি মজুমদার, প্রখ্যাত শিল্পী নীরদ মজুমদারের কন্যা। ফরাসী ফ্রেদরিক গার্ল্যাকে বিয়ে করে সে এখন মাদাম গার্ল্যা বলে পরিচিত। অদিতির মাও ফরাসী। জার্মানী সফর করে পারীতে এসে অদিতি আর ফ্রেদির আপারতোমঁ-এ উঠেছি। অ্যাপার্টমেন্ট, ফরাসী উচ্চারণে আপারতোমঁ। অদিতি নিজেকে বাঙালী বলে পরিচয় দেয়, বাংলায় কথা বলে, আর বাংলা খানা রান্না করে। কেবল সিঙাড়াটা এখনও তেমন জুত করে উঠতে পারে নি। পোশাকে অদিতি আদৌ বাঙালিনী নয়, লম্বা প্যান্টলুন আর ঢোলা জারকিন, মাথায় ছোট বড় কাটা ঘন খয়েরী চুল। কর্তাকে অদিতি খিচুড়ি খাওয়া ধরিয়েছে; ফ্রেদি দিব্যি কাঁটা চামচ না নিয়ে, স্রেফ হাত দিয়ে গ্রাস তুলে মুখে পুরে দিতে শিখে গেছে। গার্ল্যা দম্পতি আমাকে অঞ্জুর ডেরায় পৌঁছে দিয়ে চলে গেল।

অঞ্জুরও সাহেব বর, জেরার দুফ্র্যান। জেরার তখনও ঘুমুচ্ছিল। সারা রাত ফটো তুলে সে ক্লান্ত। ফটো তোলাই জেরারের পেশা।

অঞ্জু ফ্রিলান্স আর্টিস্ট। স্থানীয় শিল্পীমহলে সে মোটামুটি পরিচিত। সন্ধ্যায় পারী থেকে প্রায় ১৫০ কিলোমিটার দূরে ত্বরদাঁ বলে এক গ্রামে এক আর্টিস্ট সমাবেশে অঞ্জু আমাকে নিয়ে যাবে। ত্বরদাঁ-এ খবর দেওয়া হয়ে গেছে, কলকাতার এক আরট সমালোচক ম'সিও মালিক যাচ্ছেন মাদাম ত্বফ্র্যানের সঙ্গে সমাবেশে যোগ দিতে। ঐখানেই রাত্রের খানাপিনার নিমন্ত্রণ পেয়েছি। ফিরতে দেরি হতে পারে। কিন্তু কত দেরি হবে তখনও ঠিক আন্দাজ করতে পারিনি। তবুও অদিতিদের বলে রেখেছিলাম, হয়ত সেই রাতে না-ও ফিরতে পারি।

চুনো মাছের ঝাল আর ভাত—মনে হয়েছিল যেন অমৃত সমান। বহুকাল অঞ্জু বাস করছে পারীতে, কিন্তু আজও সে ষোলআনা বঙ্গবাসিনী। ক্ষুদে ক্ষুদে তার দুটো মেয়ে, ফরাসী আর বাংলায় সমান তুখোড়। বাংলায় কথা জিজ্ঞেস করলে তারাও চটপট উত্তর দেয় বাংলায়। জেরারের ঘুম ভাঙল বেলা দুটো নাগাদ। সদলবলে আমরা রওনা হলাম ত্বরদাঁর উদ্দেশে। না, সরাসরি ত্বরদাঁয় নয়, সিতে দেজারে কিছু কাজ ছিল জেরারের, সে নেমে গেল। আমরাও নামলাম সময় কাটাতে। যোগেন চৌধুরী, বিমল ব্যানার্জী এই সিতে দেজার থেকে আমাকে কলকাতায় চিঠি দিত। অঞ্জুর যখন বিয়ে হয়নি, সেও থাকত ঐখানেই। এখনও অঞ্জু নিয়মিত হাজিরা দেয় ওখানকার আতলিয়েরে। সিতে দেজার সম্বন্ধে কৌতূহল ছিল। একপাশে নোত্রদাম গীর্জা, একটু দূরে পালে দ জুসতিস, যেখানে মারী আঁতোয়ানেৎকে গিলোটিনে দেবার আগে বন্দী করে রাখা হয়েছিল। বাড়িটি ছিল ফরাসী রাজাদের আদি প্রাসাদ। কাছেই নেপোলিয়ানের সমাধি। একটা ঘণ্টা কখন চলে গেছে, বুঝতেও পারলাম না। ফিরছি গাড়িতে উঠব বলে, অঞ্জুর ছোটকন্যা পদ্মিনী হঠাৎ বসে পড়ল। কি হল? অঞ্জু বলল, "হিসু হিসু।" কথাটা ধরতে পারলাম না। পাশে সেইন নদী বয়ে

চলেছে, হিস্যু শব্দের অর্থ চট করে ধরা মুস্কিল। বড় মেয়ে সোনালী বুঝিয়েছিল, "পেচ্ছাব পেচ্ছাব।"

জেরার বেশ জোরেই গাড়ি চালায়। অবশ্য বাঙালী ছেলেরাও আজকাল অনেকে জোরে গাড়ি চালানোটা শিভালরি মনে করে। কিন্তু একটু তফাৎ আছে, জেরার গাড়ি চালাবার সময় পিছনের সিটে যে কেউ বসে আছে সে কথা মনে রাখা দরকার বলে মনে করে না। অঞ্জু চটপট চালকের পাশের সিটটা দখল করে বসে গেছে, আমি আর বাচ্চাদুটো পিছনে। পদ্মিনী-সোনালীর অভ্যাস আছে, দু চারবার গাড়ি মোড় ঘুরতেই আমি কিন্তু বেশ শঙ্কিত হয়ে পড়েছি। ভাবছি কলকাতায় শেষ পর্যন্ত ফিরে যেতে পারব তো? অতো-রুত-এ পড়ে, তখন আর বাঁক নেই, হু-হু করে ছুটল গাড়ি! কিছুদিন আলিয়ঁস ফ্রঁসেজ দ কালকুত্তার ছাত্র ছিলাম। ফরাসী কাম্পাইন, অর্থাৎ শহরের বাইরের বর্ণনা পাঠ্যপুস্তকে পড়েছি। হ্যাঁ, ঠিকই মিলে যাচ্ছে। রাস্তার দুপাশে লম্বা লম্বা গাছের বন, রাস্তাটা ক্রমশই নিচের দিকে নামছে। ইতিমধ্যে কোন্ সময় পদ্মিনী নিজের বুড়ো আঙুল মুখে পুরে আমার কোলে ঘুমিয়ে পড়েছে, সোনালীও ঘুমন্ত। হঠাৎ জেরার একেবারে চুল বাঁধা কাঁটার মতো বাঁক নিয়ে অন্য রাস্তায় গাড়ি দিল ঢুকিয়ে। তারপর ওপর দিকে এঁকেবেঁকে প্রায় পাহাড়ের মতোই চড়াই। একটুখানি সমতলভূমি, সেইখানে রইল গাড়ি, আমরা উঠে গেলাম এক অতি আধুনিক ভিলায়। মস্ত বড় চাতাল, জাহাজের ডেকের মতো, মাথায় ছাদ আছে। একপাশে 'বার', বিরাট এক পিয়ানোয় সুরেলা শব্দ করে চলেছেন জনৈক মধ্যবয়সী মহিলা। অনেক অতিথির সমাগম হয়েছে, অঞ্জু আমাকে একটি কুর্সিতে বসিয়ে কাকে যেন খুঁজতে গেল। জেরারও অদৃশ্য হল।

পদ্মিনী-সোনালী পাশের ফুল বাগিচায় নেমে গেছে। আমি একা বসে ব্যাপার-স্যাপার অনুধাবন করার চেষ্টা করছি। আমার

চারপাশে সাহেব মেমের ঘোরাফেরা, সবারই কৌতূহলী দৃষ্টি আমার ওপর। সামনে বিলিয়ার্ড টেবল! খেলা চলছে। একটি আনাড়ি খেলোয়াড়কে দেখা যাচ্ছে, যে আসে সেই হারায়। আনাড়ি কিন্তু দমবার পাত্র নয়, কিছুতেই সে অন্য কাউকে তার হাতের ছড়ি ছাড়বে না। একটু পর অঞ্জু ফিরে এল লম্বা চওড়া এক ভদ্রলোককে সাথে নিয়ে। আমার সঙ্গে তার পরিচয় হল। উনিই এখানকার সেক্রেটারী। ফরাসী ভাষা খুব একটা সড়গড় হয়নি আমার, বেশিদূর কথাবার্তায় এগোতে পারলাম না। কিন্তু আর্টিস্টদের সমাবেশের কথা শুনেছিলাম, কোথায় তারা? অঞ্জুও ব্যস্ত হয়ে উঠেছে, তবে সমাবেশটা কাদের? কিসের জন্যেই বা? দূরে একজন আর্টিস্টকে দেখা গেল। আমাদের প্রকাশ কর্মকারের মতো কতকটা, আবার টিনটিন কাহিনীর ক্যাপ্টেন হ্যাডকের মতোও বলা যায় ঐ আর্টিস্টের চেহারা। সঙ্গে তার অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী। স্ত্রীটির অসম্ভব রকম বড় বড় চোখ। অঞ্জুর স্বস্তি, ঐতো আর্টিস্টরা জমা হতে শুরু করেছে।

আরও এক আর্টিস্টের আবির্ভাব ঘটল, তার সংগে তিনটি জাপানী মহিলা, মহিলাদের একজন আর্টিস্টের গৃহিণী আর অন্য দু'জন সম্ভবত আর্টিস্ট গৃহিণীর আত্মীয়া। কিন্তু তারপর আর নয়, সর্বসাকুল্যে আর্টিস্টদের সংখ্যা ঐ সমাবেশে দাঁড়াল (অঞ্জুকে নিয়ে) তিনজন। জেরার ফিরে এসেছে, স্পিকটি নট হয়ে বসে আছে দূরের এক সোফায়। তার ভূমিকা এ জায়গায় গৌণ। কুর্সি ছেড়ে উঠে গিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলাম, "টয়লেটটা কোথায়?"

"ঐ যে, ওরই মধ্যে মহিলা আর পুরুষ দুইই আছে। সাবধান 'মহিলার' মধ্যে ঢুকে পড়বেন না যেন।" বয়স হয়েছে, সে ভুল আমার হবার নয়।

পদ্মিনী অন্তঃসত্ত্বা মহিলার পেটে কান ঠেকিয়ে শোনবার চেষ্টা করল ভেতর থেকে কোনও সাড়াশব্দ আসে কি না, এমন সময় ডাক

এল দোতলায় যেতে হবে, ডিনার রেডি। দলের পিছু পিছু আমিও উঠলাম। অনেক টেবল, একেক টেবলে ৮/১০ জন বসার ব্যবস্থা। মধ্যে কিছুটা জায়গা ফাঁকা রাখা হয়েছে। ফাঁকা জায়গার ওপারে দু ফিটের মতো উঁচু একটা খোলা মঞ্চ, সেই মঞ্চে বাজখাঁই গলায় গান গেয়ে চলেছে এক কৃষ্ণকায় যুবক। বাদ্য-বাদকরা আরও জনা পাঁচ ছয়। তারাও কৃষ্ণকায়। মাথার ওপর থেকে জোর আলো, কিন্তু বাদ বাকি জায়গা অন্ধকারাচ্ছন্ন। খাবার টেবলে আলোর ব্যবস্থা মোমবাতি। ওদেশে ইলেকট্রিক সাপ্লাই লোডশেডিং করে না, কিন্তু সখ করে লোকে মোমবাতি জ্বেলে ডিনার খায়। গায়ক নানান রকম মুখভঙ্গি আর অঙ্গভঙ্গি সহকারে গান গেয়ে চলেছেন একটার পর একটা। খানা তখনও এসে পৌঁছয়নি, টেবল দখল করে বসে নিমন্ত্রিতরা গান শুনছেন। তখনও মূল গায়ক মঞ্চে ওঠেন নি। অবশ্য সেটা বুঝতে পারলাম যখন ঘোষণা হল 'এবার ওয়েস্ট ইণ্ডিজ-বাসী মঁসিও'—'গান করবেন।' গায়কের নামটা নোট বই এ টুকে নিয়েছিলাম বটে কিন্তু যে ভাবে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গা করেছি, কাগজপত্র অনেক হারিয়ে গেছে, মূল্যবান টীকা নেওয়া ডায়েরীটাও কোথায় ফেলে এসেছি। নিশ্চয় ভদ্রলোক খুব বিখ্যাত গাইয়ে, নয়ত তাঁর নাম শোনামাত্র শ্রোতৃমণ্ডলী মুহুর্মুহু হাততালি দেবেন কেন? এতক্ষণ তিনি কোনও একটি টেবলের পাশে অতিথি-দের সংগে মিশে গিয়ে গা ঢাকা দিয়েছিলেন, নাম ঘোষিত হবার পর ধীরে ধীরে মঞ্চের দিকে এগোলেন। বয়স পঞ্চাশোর্ধ, পাকা কৃষ্ণবর্ণ। থ্যাবড়া থুবড়ো চেহারা, উচ্চতায় মাঝারি রকম, বেশ ভারিক্কি গতর। হাতে গীটার নিয়ে দাঁড়ালেন। মৃদু হাসি হেসে, মাথা নামিয়ে সবার অভিনন্দন গ্রহণ করে গীটারের তারে আঙুল ছোয়ালেন। তারপর গান। সে কি গলা! ওরকম ভারী গলা জীবনে কোনদিন শুনিনি আগে। শুধুই কি ভারী? কি জোর সে গলায়। অতগুলো বাজনা, ক্ল্যারিওনেট, ড্রাম, সিমবাল—সব মিলে

গিয়ে কানে আসছে যেন বজ্রগর্জন। গায়ক গাইতে গাইতে হাত-ছানি দিয়ে ইঙ্গিত করলেন, 'আর বসে কেন? উঠে আসুন, নাচুন আমার গানের সঙ্গে।' যাঁরা চেয়ারে বসে বসেই গানের তালে তালে অঙ্গভঙ্গি করছিলেন, চটপট উঠে পড়লেন চেয়ার ছেড়ে। শুরু হল স্ত্রী-পুরুষের জোড়ায় জোড়ায় নাচ। পার্টনার জুটল না তো কি হয়েছে? একাই নাচতে লেগেছেন বেশ কয়েকজন। আমি চুপটি করে বসে আছি এক কোণায়, ঈশ্বরের নাম জপছি, যদি কোনও মহিলা এসে হাত চেপে ধরেন, কী কর্তব্য হবে আমার? একটি রমণী, একহারা চেহারা, মাথায় লাল বুটিদার রুমাল বাঁধা, মুখে চোখে আনন্দ উপচে পড়ছে, একেবারে তন্ময়, একাই নেচে যাচ্ছেন।

গানের তালটা যে কি ছিল তা আমার জ্ঞানের বাইরে। কত রকম আওয়াজ, কতরকম মুখভঙ্গি, গায়ক গেয়ে চলেছেন অবিশ্রান্ত। বাজনাও বেজে চলেছে, নাচও হয়ে চলেছে। এক মস্তান গোছের ছোকরা, মাথায় ঘাড় পর্যন্ত নেমে আসা ঢেউ খেলান সোনালী রঙের চুল, আমেরিকান কাউবয়ের পোশাক; তাকে সেই আনাড়ির সংগে বিলিয়ার্ড খেলতে দেখে এসেছিলাম নিচে, সে একটু যেন বেশি মাত্রায় হাত পা ছুঁড়ছে। তারও সঙ্গিনী জোটে নি। অত হাত-পা ছুঁড়লে কি চট করে সঙ্গিনী পাওয়া যাবে? এ নাচের যে কী নাম, কাউকে জিজ্ঞেস করলে যদি বোকা বনে যাই! তবে এটা ঠিক, ও নাচ নাচার জন্যে কোনও তালিম নেবার প্রয়োজন হয় না।

ভ্যাঁ পরিবেশন শুরু হয়ে গেল। ঐ গান, নাচ আর ভ্যাঁর আশ্চর্য সমন্বয়, সবাই খুশিতে ডগমগ। আমরা বসেছি একটি গোলাকার মেজ দখল করে। আমার দুপাশে দুই জাপানী মহিলা, সামনা-সামনি অঞ্জু, অঞ্জুর দুপাশে সতীর্থদ্বয়। জেরার, পদ্মিনী, সোনালী, আর দুই আরটিস্টদের দুই গৃহিণীও বসেছে ঐ টেবলেই। জাপানী মহিলারা দুপাশ থেকে নজর রাখছেন আমি কি খাচ্ছি না খাচ্ছি। মূল খানা মুরগীর ঝোল আর ভাত। আলুভাজা, সালাদ

ইত্যাদি তো আছেই। ফরাসী দেশে ঐ রকম হৈ চৈ পার্টিতে খানা মুরগীর ঝোল আর ভাত—ভাবা যায়? রন্ধনের স্বাদ মোগলাই না হলেও, বেশ মশলাপাতির ঘ্রাণ সংবলিত। আমাদের ঘরোয়া মেয়েদের মতোই জাপানী মহিলারা, আমার প্লেটে ভাত ফুরিয়েছে তো, কিছুটা ভাত তুলে দিলেন টেবলের মধ্যে রাখা নৌকাকার পাত্র থেকে, মাংস ফুরোতে আপত্তি সত্বেও গুটিকয়েক কুক্কুটখণ্ড পরিবেশন করলেন সন্তর্পণে আমার পাতে। পানীয় গ্লাস খালি, তা তৃতীয়বার পরিপূর্ণ হয়ে উঠল ভঁ্যা-এ। আমি বিদেশী অতিথি, আমার সংকোচ থাকতে পারে, তাঁরা আমার দুপাশে বসেছেন, আমি ঠিক মতো আপ্যায়িত হচ্ছি কিনা—সেটা দেখা তো তাঁদেরই কর্তব্য! সেক্রেটারী সাহেব অতি বিনয়ী হয়ে জিজ্ঞেস করে গেলেন—কোনও অসুবিধা হচ্ছে না তো? ইংরাজী বাক্যের কোনও উচ্চারণ নেই, ইংরাজী জানলেও কেউ বলবে না, ওখানে ইংরাজী বলাটা তো বেআদবি। নাচিয়েরা দু একজন তখনও নাচের ঘোরে রয়েছেন বটে, বাদবাকি খেতে বসে গেছেন। গাইয়ে বাজিয়েরা তাঁদের কাজ করে চলেছেন অবিরাম।

আহার শেষ, তবুও বসে আছি। একটু পরে অঞ্জু বলল, "চলুন অহিদা, নিচে যাই, বুঝতে পারছি এই আওয়াজ আপনাকে বেশ কষ্ট দিচ্ছে!" হাতে স্বর্গ পেলাম। এক তলায় গিয়ে বিশ ত্রিশ মিনিট আরও বসতে হল, সেক্রেটারীর সংগে দেখা না করে কেটে পড়াটা অভদ্রতা হবে। পদ্মিনী-সোনালী অত রাত্রেও বেশ চাংগা রয়েছে, আরও দু একটি সমবয়সী ছেলেমেয়ের সংগে হুড়োহুড়ি শুরু করে দিয়েছে। আমরা মঁসিও সেক্রেটারীর জন্যে অপেক্ষমান সে কথা তাঁর কানে যাওয়ায়, ভদ্রলোক হন্তদন্ত হয়ে নেমে এলেন। বিদায়ের পালা শেষ করে আমরা যখন গাড়িতে উঠলাম তখন রাত একটা। পার্টি চলবে সারারাত্রি।

"ব্যাপারটা কি হল?"

অঞ্জুর উত্তর, "সত্যি বলতে কি, আমিও প্রথমটা ঠিক বুঝে

উঠতে পারিনি। আজ ছিল, আসলে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ নাইট, আরটিস্ট সমাবেশ নয়। ত্বরদা-এর এই ভিলায় শিল্পীরা, সাহিত্যিকরা, এসে থাকতে পারেন, কাজ করতে পারেন—কতকটা ক্লাব গোছের। আর, মাঝে মাঝে এই রকম পার্টি হয়। আপনার কথা সেক্রেটারীকে বলতে তিনি সাগ্রহে অনুরোধ করলেন আপনাকে এখানে নিয়ে আসতে। আপনার খাওয়া দাওয়ার কোনও বাছবিছার আছে কিনা তাও উনি জেনে নিলেন।"

জেরার গাড়িতে স্টার্ট দেবার আগেই সেই ক্যাপটেন হ্যাডক ভদ্রলোক কায়দা করে গাড়ি নিয়ে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল। এঁকে বেঁকে গড়গড়িয়ে আমাদের গাড়ি নামল টিলা থেকে, বড় রাস্তায় পড়েই উর্ধশ্বাসে ছুট। পিছনে আসছে আরেক আরটিস্ট, এঁর চেহারা টিনটিন উপাখ্যানেরই আর এক চরিত্র ক্যালকুলাসের মতো। অবশ্য, এর টাক নেই। কে কত জোরে গাড়ি চালাতে পারে তার পরীক্ষা শুরু হয়ে গেছে। ক্যাপটেন হ্যাডকের ছোট্ট গাড়ি দেখতে দেখতে নাগালের বাইরে। মিনিট পনের পর কোঁ-কোঁ শব্দ করতে করতে জেরারের গাড়ি গেল থেমে। রাত তখন প্রায় সওয়া একটা। সর্বনাশ! দু-পাশে শুধু জঙ্গল। না কোনও বাড়ির, না কোনও গাড়ির চিহ্ন। জেরার ইঞ্জিন পরীক্ষা করে মাথা নাড়ল, কোনও উপায় নেই! অঞ্জু গুম মেরে বসে আছে। কি করণীয়? ক্যালকুলাসের গাড়ি এসে থামল পাশে। ক্যাপটেন হ্যাডকও সাড়া শব্দ না পেয়ে ফিরে এসেছে। অঞ্জুর মুখে একটাও কথা নেই। আমি গাড়ি থেকে নেমে পড়েছি। আমার কিছুই করার নেই, কোনও দুশ্চিন্তাও নেই! তিন পালোয়ান মিলে বিগড়ান গাড়িটা রাস্তার এক পাশে সরিয়ে দিল, ও-গাড়ির খোঁজ হবে আবার পরের দিন। মেয়ে দুটোকে জাপানী-ফরাসী পরিবার তুলে নিল, আর অঞ্জু, জেরার এবং আমি ঠেসেঠুসে বসলাম ক্যাপেটেন হ্যাডকের গাড়িতে। তারপর সে কি চোট অঞ্জুর! গাড়ি খারাপ তো সে

গাড়ি নিয়ে বেরোবার কি দরকার ছিল! বেচারা জেরার একটাও প্রতিবাদ করছে না। ফরাসী হলে কি হবে? বর তো বটে! আবার বাঙালিনীর বর! বাক্যিবাণ সহ্য করতে হবে না? অঞ্জুর আবাসে যখন পৌঁছলাম তখন রাত দুটো ডিঙিয়ে গেছে, ফ্রেদি-অদিতির ঠিকানায় ফিরে যাবার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। জাপানী মহিলারা ফরাসী কায়দায় 'অরো ভোয়ার' জানিয়ে বিদায় নিয়েছেন।

পরের দিন সকালে আটটা নাগাদ, এক কাপ করে চা খেয়ে, আমি আর অঞ্জু বেরিয়ে পড়লাম। জেরার তখনও অঘোরে ঘুমুচ্ছে, সোনালী-পদ্মিনীও ঘুমুচ্ছে, তাদের ঘুম ভাঙবে অনেক বেলায়। ওদের ঘুম ভাঙার আগেই আমাকে অদিতির বাড়ি পৌঁছে দিয়ে অঞ্জু ফিরে আসবে। মেত্রোয় যাওয়াই সুবিধে। খুব কাছেই স্টেশন। চার-পাঁচটা বাড়ির পরেই মোড়, বাঁ দিকে ঘুরলেই স্টেশনের মুখ। এ কি? মোড়ের কোণার দোকানটা ভেঙে চুরমার! থমকে দাঁড়িয়ে অঞ্জু বলল, "ভয় হয়, জেরারও একদিন এই রকম কিছু কাণ্ড ঘটিয়ে বসবে।" আগের রাতে কোনও অসাবধান গাড়ি চালকের ঐ কাজ।

অদিতির রু ত্য শার্স মিদির ফ্ল্যাট ছ তলায়। পুরানো বাড়ি, লিফট নেই, অঞ্জু আর আমি হাঁপাতে হাঁপাতে উঠলাম। অদিতির সাধের কুকুর 'কুমারী' আমাদের পায়ের শব্দ পেয়ে ঘেউ ঘেউ শুরু করে দিয়েছে। কুমারীর চেহারা শতকরা একশ ভাগ ক্যালকেশিয়ান। কুমারীকে দেখে অঞ্জুর প্রশ্ন, "একে কোথেকে পেলে, দেশ থেকে এনেছ?" না, অদিতি পারীরই কোনও কেনেল থেকে আবিষ্কার করেছে কুমারীকে। কুমারী নাম দিয়েছেন অদিতির ফরাসী মা। খাবার ঘরের মেঝেতে কে যেন শুয়ে না? ফ্রেদির অনুজ জেভিয়ার। অদিতির শ্বশুর-শাশুড়ি কাম্‌পাইনে গেছেন, জেভিয়ারের ওপর ভার ছিল শহরের আপারতোমঁ পাহারা দেবার,

কিন্তু আগের রাত্রে গুটিকয়েক সমাজবিরোধী ঘরের দরজায় অনবরত লাথি মারতে থাকে। টেলিফোন পেয়ে দাদা ফ্রেদি আর বৌদি অদিতি জেভিয়ারকে এ বাড়ি নিয়ে এসেছে। সে খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিল। ১৭-১৮ বছরের জেভিয়ার গাল্যাঁ, বেশ শক্তিশালী চেহারা, আমাদের শব্দ পেয়ে ধড়মড়িয়ে উঠে বসল। আমরা সেখানে 'এত্রাঁজের' কেমন করে শুয়ে থাকবে সে? সে ইংরেজী বলতে পারে 'এ লিত্তেল'। দু-চার কথার পর বিছানা গুটিয়ে পিঠে তুলে নিয়ে সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে জেভিয়ার বেরিয়ে গেল। অদিতি বলল, "কারা আবার, ওরই বন্ধুরা রাতে উৎপাত করেছিল। ওর যত সব বদ সঙ্গী! আজকাল এখানে ও-বয়সী ছেলেরা একটা সমস্যা। দল বেঁধে ঘোরে, নানান রকম নেশা করে আর যখন তখন মারপিট।" আজকাল তো নয়, ও সমস্যা পারীর চিরকালের।

সুপ্রিয় মুখার্জী বহুকাল যাবৎ পারীতে। একদা যুগান্তর কাগজের চিত্র সমালোচক এই সুপ্রিয়। ওদেৎ তৎ নাম্নী ফরাসী মহিলা শান্তিনিকেতনে আসে বৃত্তি লাভ করে। ওদেৎ চিত্রকর। সুপ্রিয়র সংগে প্রেম হয় ওদেতের, পরে বিয়ে হয়। ওদেৎ দেশে ফিরে গেছে। এক পুত্র, এক কন্যা আর সুপ্রিয়কে নিয়ে পারীতে ওদেতের সংসার। সুপ্রিয় খবর পেয়েছে আমি পারী এসেছি। খবরটা তার পক্ষে বিশ্বাস করাই অসম্ভব। অ্যাডেলড-এ তিন বছর আগে যখন বিশ্ব আরট কংগ্রেসে যোগ দিতে গিয়েছিলাম, আমার টেলিফোন পেয়ে জঁা ফ্রাঁসোয়া মরও সুপ্রিয়র মতো ভাবতেই পারেনি যে কলকাতার 'অহিবুশন' অষ্ট্রেলিয়া পৌঁছেছে। সত্যি কিনা যাচাই করে নিতে সুপ্রিয় টেলিফোন করল; টেলিফোনের অন্য প্রান্তে আমার গলা শুনে তবে সে বিশ্বাস করে পারী শহরে আমার উপস্থিতির কথাটা। আমার সঙ্গে দেখা করার জন্যে সে ছটফট করছে, কিন্তু সেদিন বিকেলে ফ্রেদি-অদিতির সাথে মঁমার্তরে যাব ঠিক করে রেখেছি যে! বেশ! মঁমার্তর থেকে ফেরার পথে এক

রেস্তোর াঁয় অপেক্ষা করবে সুপ্রিয়। সেখানেই দেখা হবে তার সঙ্গে।

আরট ইতিহাসে মঁমার্তর বড়সড় পরিচ্ছেদ দখল করে আছে। এক সময় পারীতে মঁমার্তর ছিল সব সাংস্কৃতিক আন্দোলনের কেন্দ্র, আরটিস্টদের, কবিদের, সাহিত্যিকদের ঘাঁটি। মঁমার্তরে আবাস ছিল তুলুজ লোত্রেকের, পল গগ্যাঁর, ফান গঘের। এখনও সেই বিখ্যাত নাচঘরটি মুলাঁ দলা গালে. সামনে প্রকাণ্ড বড় হাওয়াকল পাখা নিয়ে সগৌরবে দণ্ডায়মান, কিছুমাত্রও রঙ টসকায়নি। মঁমার্তরের অলিতে গলিতে ঘুরে বেড়াত মরিস উত্রিও আর আমেদেও মদিগ্লিয়ানী কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে। মঁমার্তরেই রেস্তোর াঁর উচ্ছিষ্ট খাবার খেয়ে বড় হয়ে উঠেছিল উত্রিওর মা সুজান ভালাদোঁ। সার্কাসের ট্রাপিজ খেলোয়াড়, পা ভেঙে যাবার পর ধোপানী, তারপর আরটিস্টের মডেল, শেষে বিখ্যাত চিত্রকর। এই সুজানের কতই না দুশ্চিন্তা ছিল তার পিতৃপরিচয়হীন পুত্র মরিস উত্রিওকে ঘিরে। সুজান আর মরিসের কথা না বললে কি মঁমার্তরের কথা সব বলা হয়? মঁমার্তরের ছবি তার স্বকীয় প্রকাশভঙ্গিতে উপস্থাপন করে উত্রিও পেয়েছিল লেজিওঁ দ'নর সর্বোচ্চ সরকারী খেতাব। এক জারজ, কিন্তু তার প্রতিভা অস্বীকার করা সম্ভব হল না। ঐ মঁমার্তরেই ভূমিষ্ঠ হয়েছিল কিউবিসম—জর্জ ব্রাক আর পাবলো পিকাসোর কীর্তি। লোকে বলে, 'মঁমার্তরই পারী আর পারীই মঁমার্তর।'

পিকাসোর একসময়কার স্টুডিওর সামনে ঘাসের ওপর বেশ কয়েকটি যুবক আর যুবতী উবু হয়ে বসে শুনছে, লেকচার দিচ্ছেন এক বৃদ্ধা। পিকাসো সম্বন্ধেই কিছু বলা হচ্ছিল নিশ্চয়। হয়ত ঐ বৃদ্ধা পিকাসোর যৌবনের কোনও সঙ্গিনী। গড়ানে সড়ক ধরে উঠতে উঠতে আমরা তিনজন পৌঁছলাম গিয়ে এক পার্কের পাশে। চতুষ্কোণ পার্কের চারপাশে অসংখ্য আরটিস্ট। কেউ পেইন্টিং করছে, কেউ

পেন্সিলে প্রতিকৃতি আঁকছে, কেউ বা ম্যাণ্ডোলিন সহকারে গান গাইছে। সারা বিশ্বের পর্যটকদের ভিড় সেখানে। প্রতি রবিবার মঁমার্তর হয়ে ওঠে সরগরম, অন্যদিন থাকে প্রায় নিঃস্তব্ধ। আগে কিন্তু এমনটি হত না, সপ্তাহের কোনও বারই ঘটনাবিহীন ভাবে কাটেনি তখন। এখন বেশির ভাগ গৃহই বন্ধ, পরিত্যক্তও হতে পারে। এ রাস্তা সে রাস্তা ঘোরাঘুরি করে মঁমার্তর থেকে পা-পা করে নেমে পড়লাম। বলছি নেমে পড়লাম, কারণ মঁমার্তর কতকটা আমাদের কোনও পাহাড়ী শহরের মতো, পারীর অন্য সব অঞ্চল থেকে বেশ উঁচু। কথা আছে সন্ধ্যা ছ'টার মধ্যে সুপ্রিয়র সংগে সেই রেস্তোরাঁয় দেখা করতে হবে।

সুপ্রিয়কে দেখে প্রথমটা চিনতে পারিনি। তার মাথায় টাক পড়েছে, ঝুলপির চুল সাদা হয়ে গেছে। আমাদের তিনজনকে দূর থেকেই দেখতে পেয়েছে, রেস্তোরাঁর সামনে সহাস্য বদনে সে অপেক্ষা করছে। ঐ রেস্তোরাঁয় প্রতি সন্ধ্যায় বসে পারীর বাঙালীদের আড্ডা। ওখানে পৌঁছতে পারলে সব বাঙালীদের সংগে দেখা হয়ে যাবে। চেহারায় রেস্তোরাঁটিকে আদৌ প্রথম শ্রেণীর বলা যাবে না। দুধ চিনি সব একসংগে মেশান চা এল সামনে, স্বাদে তা কলকাতার সাঙ্গুভ্যালী কাফের চায়ের মতোই। বুঝলাম, বেছে বেছে স্থানীয় বাঙালীরা আবিষ্কার করেছেন উপযুক্ত ঐ রেস্তোরাঁটি। এক বয়স্ক বাঙালী দম্পতি এলেন। স্ত্রীটি ফরাসী কায়দায় দুগালে চুম্বন করে করে পরিচিত দু এক জনের সংগে সদ্ভাব বিনিময় করলেন। দেশের কথা জানতে কেউ যেন খুব একটা আগ্রহী নন, পারীই তাদের মনের সবটা জুড়ে আছে। কথাবার্তাও বলছেন তাঁরা নিজেদের মধ্যে ফরাসী ভাষায়। কেন তবে এই বাঙালী সম্মেলন? চায়ের দাম মিটিয়ে দিয়ে সুপ্রিয় উঠে পড়ল, "চলুন একটু হাঁটা যাক।" মনে পড়ল, আমার পাশপোর্টটা অদিতির হাতঝোলায়। অদিতি সাবধান করে দিয়েছিল পাসপোর্ট ছাড়া যেন ওখানে কখনও

চলাফেরা না করি। কিন্তু সে তো এতক্ষণে বাড়িতে রান্না-বান্না নিয়ে ব্যস্ত। সুপ্রিয় অভয় দিল, "কুছ পরোয়া নেই, আমি তো সঙ্গে আছি।" শক্তিও চলেছে, হঠাৎ তার মনে পড়ল কি যেন একটা ভীষণ দরকার, শক্তি কেটে গেল।

এক দোকান থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই গরম মাছভাজা, নরম পাঁউরুটি, আলুভাজা আর মিষ্টি জল খেয়ে একটু দম নিয়ে শুরু হল হন্টন। এ রাস্তা সে রাস্তা হয়ে প্যাঁপিদু সেন্টারে পৌঁছলাম। পাড়াটার নাম ববুর। প্যাঁপিদু সেন্টারে সমকালীন আরট-এর মিউজিয়াম। এক মাস ধরে ইউরোপ ঘুরছি, নানা শহরের ক্লাসিক আরট সংগ্রহ দেখে দেখে চোখ জুড়িয়ে গেছে। আমার সমালোচকের দৃষ্টিভঙ্গি বেশ নাড়া খেয়েছে। মডার্ণ আরট আর যেন সহ্য করতে পারছি না, কিন্তু তাহলেও মডার্ণ আরট দেখতেই হবে, সব কিছু দেখাই যে এ অধমের কাজ! পিকাসো, কানডিনস্কী, পল ক্লী, ব্রাক, মাতিস সোনিয়া দোলোনে, রব্যার দোলোনে এবং পরবর্তী সব সমকালীন রথী-মহারথীদের কাণ্ডকারখানার মেলা—কত পরীক্ষা নিরীক্ষা, কত অভিনব ভাবনা চিন্তা, ফরম আর রঙ নিয়ে কত কসরৎ! কিন্তু কোথায় সেই মুন্সিয়ানা, কোথায় সেই অনুভূতি, কোথায় সেই ধ্যান, কোথায় সেই আন্তরিকতা যা উপলব্ধি করা যায় গ্রীক আরট-এ, রণেসাঁস আরটে আর বারোক আরট-এ? লোহালক্কর আর কাচের তৈরি ববুরের মিউজিয়াম, মনেই হবে না শিল্প সংরক্ষণাগার। মাফ করবেন, ও বাড়ির স্থাপত্য শিল্পে কোথাও নেই সুকুমার স্পর্শ। ও বাড়ি যেন এক কলকারখানা। সুপ্রিয় সমকালীন আর্ট-এর সমর্থক, খুব উৎসাহ নিয়ে আমাকে ঘোরাচ্ছে। আমি ভাবছি কখন বেরুব এ খাঁচা থেকে। বললাম, "আজ অনেক রাত হয়েছে, আবার কাল আসা যাবে ববুরে।"

বেটার লেট দ্যান নেভার। বেরিয়ে পড়লাম। না হাঁটলে প্যারী দেখা অসম্ভব। গাড়ি চড়ে চড়ে যাঁরা হাঁটার ক্ষমতা

হারিয়েছেন তাঁদের পক্ষে পারী যাওয়াই বৃথা। আমি খবরের কাগজের লোক। পারীর সবচেয়ে নামকরা কাগজ ল মঁদের অফিস সুপ্রিয় আমাকে দেখাবেই। বাগবাজারের যুগান্তর-পত্রিকার মতোই এক গলিঘুঁচির মধ্যে ল মঁদের অফিস। বাইরে থেকে দারুণ কিছু মনে হল না। আবার হণ্টন, সুপ্রিয় সিগারেট কিনবে, এক দোকানে কিউ-এ দাঁড়াল, আমি দোকানের বাইরে ফুটপাথে অপেক্ষা করতে লাগলাম। ফুটপাথের ওপর বেশ লোকজনের আনাগোনা। চৌরঙ্গীর ফুটপাথে যত দোকান বসে অবশ্যই সংখ্যায় অত নয়, তা হলেও দিব্যি টেবল সাজিয়ে জিনিসপত্র বিক্রি হচ্ছে। বার্লিনেও হাঁটা পথের ওপর দোকানিদের বসতে দেখেছি, সুতরাং ইউরোপে ফুটপাথে দোকান বেআইনী নয়। নানা রকম পণ্য দ্রব্যের ব্যবসা চলেছে, সেই সঙ্গে এক জাতীয় স্ত্রীলোকও ঘোরাফেরা করছে পুরুষ-দের ওপর নজর রেখে। পৃথিবীর প্রাচীনতম এ ব্যবসা ফ্রাঁসের মতো স্ত্রী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার দেশেও দিব্যি চালু! দেখলাম, টপ টপ খরিদ্দার ধরে ফেলল জনা তিন চার পসারিনী। হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছলাম সাঁ সালাজার স্টেশনে। বললাম "ভাই সুপ্রিয়, আর যে পারছি না, পায়ের অবস্থা খুব কাহিল।" সাঁ সালাজারে যাবার উদ্দেশ্য—"রবীন্দ্রনাথ লণ্ডন থেকে পারী এসেছিলেন রেল-গাড়িতে; সেই সাঁ সালাজারেই তিনি পারীর মাটিতে পা রেখে-ছিলেন প্রথম। ঐ সিঁড়ি বেয়ে তিনি অপেক্ষমান মোটর গাড়িতে উঠেছিলেন। ড্রাইভার নেমে এসে তাঁর সঙ্গে করমর্দন করে, সে চিনতে পেরেছিল উনিই জগৎবরেণ্য রবীন্দ্রনাথ।" কিন্তু আমার যে আর পা চলছে না! সুড়ঙ্গ ধরে নেমে গেলাম মেট্রো রেল স্টেশনে। সর্বনাশ, দুই ছোকরার একেবারে বুকের ওপর রিভল-বারের নল! পুলিশ তাদের পকেট থেকে সব টেনে বার করে পরীক্ষা করছে! ছোকরারা শ্রীগৌরাঙ্গ ভংগীতে কম্পমান! আমার তো আত্মারাম খাঁচা ছাড়া, সংগে পাশপোর্ট নেই, পুলিশ যদি আমার

দিকেও তেড়ে আসে কে রক্ষা করবে? সুপ্রিয়? সুপ্রিয়র মুখে শব্দটি নেই, সন্তর্পণে পুলিশের পাশ কাটিয়ে সে অগ্রসর হল, আমি তাকে অনুসরণ করলাম। যখন গার্ল্যাদের আপারতোমঁ-এ পৌঁছেছি, রাত প্রায় এগারটা। অদিতি আর ফ্রেদির খাওয়া হয়নি, আমার জন্যে তারা বসে আছে। পায়ে হেঁটে সাঁ সালাজার গিয়েছিলাম শুনে অদিতির চোখ ছানাবড়া, "করেছেন কি? অতদূর আপনাকে হাঁটিয়ে নিয়ে গিয়েছিল?" আহারান্তে শুয়ে পড়লাম, পরের দিনের কথা পরের দিন ভাবা যাবে। অবাঞ্ছিত চরিত্রদের প্রায়ই ফরাসী পুলিশ ঘেরাও করে ধরপাকড় করে, অঞ্জু চৌধুরীও একবার ধরা পড়েছিল। "বিশ্বাস করুন অহিদা, আমি কিন্তু সেদিন একেবারে বেচাল ছিলাম না। কি কাণ্ড! জেরার শেষে আমাকে থানা থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসে।"

বাড়িতে দ্বিপ্রাহরিক আহার ওদেশে প্রায় কেউই করে না; সকালে ব্রেক-ফাস্ট, ওখানে বলে পতি-দেজনের, সেরে বেরিয়ে পড়া, সময় হলে কোনও রেস্তোরাঁয় ঢুকে কিংবা কোনও দোকান থেকে কিছু খাবার কিনে কোথাও বসে উদরস্থ করে আবার কাজে লাগা; সন্ধ্যায় ডেরায় ফিরে রান্নাবান্না, তারপর ডিনার, এইটেই রীতি। কোথায় যাব? রদ্যাঁ মিউজিয়াম খুব দূরে নয়। সকালে বেরিয়ে পড়লাম। মনে হয় পনের বিশ মিনিট হেঁটেছিলাম। আগের রাত্রের হাঁটার ক্লান্তি তখনও পা দুটোকে বেশ ভারি করে রেখেছিল, কিন্তু রদ্যাঁর ভাস্কর্য দেখার উৎসাহে সে ক্লান্তি আর বোধ করছি না।

রদ্যাঁর মতো অত অবমাননা, লাঞ্ছনা আর টিপ্পুনি জগতে আর কোনও শিল্পীকে ভোগ করতে হয়েছে কি না সন্দেহ। আবার রদ্যাঁ যতটা পূজিত এবং সম্মানিত হয়েছেন তেমন ভাগ্যও কোনও শিল্পীর কপালে অদ্যাবধি রেখা টানেনি। প্রকাণ্ড বড় রদ্যাঁ মিউজিয়াম—'মুজে রদ্যাঁ।' সংগে মস্ত বাগান। ফোয়ারা আছে। রাজহংস তার শাবকদের নিয়ে হেলেদুলে বিচরণ করে বেড়ায় সারা ফুল

বাগিচায়। থমকে থমকে তিষ্ঠতে হয় অসাধারণ একেকটি মূর্তির সামনে। সৃষ্টি বটে! সমকালীন ভাস্কর্যের প্রথম চ্যাপটার, রদ্যাঁর ক্রিয়াকৌশল ও আঙ্গিক। মিকেলাঞ্জেলোর প্রতি ষোল আনা শ্রদ্ধা নিয়েও রদ্যাঁ রণেসাঁস প্রভাবিত সকল দৃষ্টিভঙ্গির পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছিলেন স্বকীয় চিন্তা, স্বকীয় অনুভূতি, স্বকীয় আঙ্গিক প্রতিষ্ঠা করে। নবরূপ লাভ করল এ কালের ভাস্কর্য। কি পাথর কাটায়, কি ব্রোঞ্জ ঢালাই-এ রদ্যাঁর ভাস্কর্য আজও অপরাভূত। মডার্ণ ভাস্কররা অভিনব সব কাজ করেছেন এবং করছেন বটে, কিন্তু চিরন্তন হয়ে থাকবে এমন কাজ কি কিছু হয়েছে? রদ্যাঁর সৃষ্টি গ্রীক ক্লাসিক কিংবা মিকেলাঞ্জেলোর ভাস্কর্যের মতই স্থায়ী আসন দখল করে বসে আছে শিল্প দরবারে, ভবিষ্যৎকাল তার মূল্য অস্বীকার করতে পারবে না—একথা মহা মহা বোদ্ধাদের। রদ্যাঁর 'থিংকার'—থুতনিতে হাত দিয়ে মাথা নিচু করে চিন্তায় মগ্ন; ভদ্রলোক বিদগ্ধ সমাজে অতি পরিচিত। থিংকার কিন্তু স্বতন্ত্র কোনও ভাস্কর্য নয়, মস্ত কম্পোজিশন 'গেট অব হেলস'-এর একটি ফিগার। থিংকারকে গেট অব হেলস থেকে রি-কাস্ট করে তুলে নেওয়া হয়েছে। মিকেলাঞ্জেলোও থিংকার গড়েছেন। রদ্যাঁর থিংকার খেটে খাওয়া মানুষ—বিশ্ব মানবকুলের প্রতিনিধি। আর মিকেলাঞ্জেলোরটি কোনও রাজপুরুষ। রদ্যাঁর কবরের ওপর বসিয়ে দেওয়া হয়েছে থিংকারের রেপ্লিকা—রদ্যাঁই তো থিংকার! রদ্যাঁর আরও একটি চিরস্মরণীয় সৃষ্টি বালজাকের প্রতিমূর্তি। একটি নয়, দুটি নয়, বালজাক সৃষ্টি করেছিলেন শিল্পী ঠিক যে কটি তা বলতে পারব না, তবে রদ্যাঁ মিউজিয়ামের মধ্যস্থ প্রশস্ত কক্ষে ছ'ছটি বালজাককে দেখেছি। ওরই মধ্যের একটি বর্ধিত আকারে দণ্ডায়মান এক জমজমাট রাজপথের ধারে। কেউ করেছেন মূর্তিটির ভূয়সী প্রশংসা কেউবা নিন্দায় হয়েছেন পঞ্চমুখ। নিন্দা শেষ পর্যন্ত ধোপে টেঁকেনি। রদ্যাঁর কাজ করার সাজ সরঞ্জাম, ব্যক্তিগত সংগ্রহ—ছবি, মূর্তি, কিউরিও ইত্যাদি—তাও সংরক্ষিত

রদ্যাঁ মিউজিয়ামে। দৃষ্টি পড়ল 'পেরে তাঁগের' ওপর, ফান গঘের সেই বিখ্যাত প্রতিকৃতি রচনাটি। পেরে তাঁগে ছিলেন ইমপ্রেসনিস্ট শিল্পীদের বড় বন্ধু লোক। ধারে রঙ কিনতে হলে সবাই ছুটতেন তাঁগের কাছে। রঙের দাম মেটাতে অনেক শিল্পীরা তাঁকে দিতেন ছবি এঁকে। সম্ভবত সেভাবেই ঐ প্রতিকৃতির হয়েছিল সৃষ্টি। ওটি শেষে রদ্যাঁ-সংগ্রহে স্থান পেয়েছে। মহাশিল্পের সমঝদার না হলে কি মহাশিল্পী হওয়া যায়?

মুজে রদ্যাঁ থেকে বেরিয়ে আবার হন্টন। অদিতি মাঝে মাঝে চিউইংগাম তার ঝোলা থেকে বার করে আমার হাতে ধরিয়ে দেয় এবং লক্ষ্য রাখে, মোড়ক ছাড়িয়ে গামটি মুখে পোরার আগেই সে আমার হাতের চটকান কাগজ খপ করে কেড়ে নিয়ে নিজের ব্যাগে পুরে ফেলে, পাছে বদঅভ্যাস বসত রাস্তায় যেখানে সেখানে সেটি ফেলে বসি। ওদেশে পথ নোংরা করা অমার্জনীয় অপরাধ।

জো দ পম্। খোদ লুভ্‌র মিউজিয়ামের মধ্যে না হলেও, লুভ্‌রেরই একটি অঙ্গ ঐ জো দ পম্। ইমপ্রেসনিস্ট চিত্রকলায় মিউজিয়াম। ওখানে আছে সেজান, দেগা, পিসারো, সোরা, সিসলী মানে, মোনে, মরিজো, লোত্রেক, গগ্যাঁ, গঘ প্রমুখদের কলাকীর্তি। সমকালীন আরট-এর বীজ রোপন হয়েছিল ইমপ্রেসনিস্টদের কাজে। বুকের পাটা ছিল বটে তাঁদের। শত শত বছরের প্রথা হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়ে তাঁরা এগোলেন রেয়ালিজম-এর ঝাণ্ডা উঁচিয়ে। প্রথাগত বিষয়বস্তুরই শুধু যবনিকা পড়েনি, পরীক্ষা নিরীক্ষায় ক্রিয়াকৌশলেও পাল্টে গেল আমূল। সবাই তখন তরুণ, নতুনভাবে জগৎটাকে দেখার এবং দেখানর ইচ্ছায় বেপরোয়া। নতুন ফরম চাই, নতুন রঙ চাই! বিপ্লবী হলেও তাঁরা কিন্তু ট্র্যাডিশনের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করেন নি, বরং ট্র্যাডিশনই ছিল তাঁদের পথ প্রদর্শক।

পল গগ্যাঁ আর ফান গঘের ভক্ত আমি। উপন্যাসাকারে এঁদের জীবনী প্রকাশ হয়েছে। কিন্তু এঁদের সত্য জীবনী উপন্যাস

অপেক্ষা অনেক অনেক বেশি উপভোগ্য ! গঘ ও গগ্যাঁর কাজের প্রিণ্ট দেখেছি প্রচুর, কিন্তু সে কি মেজাজ অরিজিনাল ছবির ! আমার ভাষা নেই তা বোঝাবার ! দক্ষিণ সাগরের ইভাওয়া দ্বীপে পল গগ্যাঁ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। যৌন ব্যাধি আক্রান্ত হয়ে তাঁকে শেষ কটা দিন অসহ্য শারীরিক যন্ত্রণায় কাটাতে হয়েছিল, কিন্তু ছবি আঁকা থেমে যায়নি। মৃত অবস্থায় তাঁর কুটিরে যখন পলকে দেখা গেল তখনও একটি ছবির রঙ রয়েছে কাঁচা। 'ব্রিতানীতে তুষারপাত' অসমাপ্ত রেখে গগ্যাঁ ইহলোক ছেড়ে যান। শিল্পীর সব ছবি আর আসবাবপত্র নিলামে তোলা হল। তার একাধিক অপরাধের জন্যে সরকার কিছু জরিমানা ধার্য করেছিলেন। সেটা তো উশুল করতে হবে। 'ব্রিতানীতে তুষারপাতের' দাম উঠল নিলামে ছ ফ্রাঁক, মানে ১২ টাকা। বর্তমানে ও ছবির দর ৬ লক্ষেরও দশগুণ। ওটি এখন জো দ পম্-এর গর্ব-সংগ্রহ। আর গঘ ? একপ্রেসনিসমের জনক। বার্লিনের ব্রুকে, আর মিউনিখের ব্লু রাইডারদের অনুপ্রেরণা এই দুই মহানায়ক। কত উপন্যাস রচনা হয়েছে, কত গল্প বলা হয়েছে, কত গবেষণা হয়েছে এ দুই খ্যাপা শিল্পীর জীবন অবলম্বনে। সিনেমাও হয়েছে। এ হেন মাস্টারদের হাতের স্পর্শ লাগা ক্যানভাসের সামনে দাঁড়ালে উত্তেজনা হবে না ?

বিকেলে বিশ্রাম নিচ্ছিলাম, কাঠের সিঁড়িতে ধুপধাপ জুতোর শব্দ শুনে বুঝতে পারলাম সুপ্রিয় এসে পড়েছে। পারীর নামকরা প্রায় সব আর্টিস্ট আর আরট ক্রিটিকদের সংগে সুপ্রিয়র দোস্তি। জাঁকাসুর মতো ক্রিটিকের সংগেও তার রীতিমতো যোগাযোগ। কানডিনস্কির বিবাহিতা স্ত্রী নীনা, ফরাসী দিকপাল শিল্পী ব্যারনার বুফের সংগে ওঠাবসা করা সুপ্রিয়, শক্তি বর্মন মাধ্যমে খবর পাঠিয়েছিল—পারীর নেতৃস্থানীয় শিল্পী আর সমালোচকদের এক সমাবেশ হচ্ছে, সেখানে আমার উপস্থিতি একান্ত বাঞ্ছনীয়। আমি খবরটা পেলে তবেই না যাব সেখানে ; যথারীতি খবর পাইনি। দেখা

হতে সুপ্রিয় বলে যে কলকাতার ক্রিটিকের সংগে আলাপ করার আগ্রহে সে সন্ধ্যায় অনেকেই নাকি বহুক্ষণ অপেক্ষা করেছিলেন। হায় হায় করা ছাড়া আমার আর কি উপায়? এমন সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেল! কার মুণ্ডপাত করব? বাড়ি বাড়ি গিয়ে ওঁদের সঙ্গে আলাপ করব সে সময় আমার হাতে নেই।

তবে সুপ্রিয়র বাড়ি যেতেই হবে। সে এসেছে আমাকে নিয়ে যেতে, রাতে তার বাড়িতে খাবার নিমন্ত্রণ। কি ভাবে কোন্ পথ দিয়ে পৌঁছলাম সবটা মনে রাখতে পারলাম না। তবে ভাবনার কিছু নেই, সুপ্রিয়ই আমাকে ফেরত দিয়ে যাবে রু দ শ্যাস´ মিদিতে। খানিকটা পথ সুবার্বান ট্রেনে যেতে হয়েছিল। কলকাতায় প্রতিদিনই আমাকে সুবার্বান ট্রেনে যাতায়াত করতে হয়, এখনকার সুবার্বান ট্রেনের কথা আমি হাড়ে হাড়ে জানি। কিন্তু পারীর সুবার্বান ট্রেনে দম ফাটানো ভিড় নেই, কি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, কি সুন্দর, আর কি চমৎকার সার্ভিস! এক মিনিটও সময়ের এধার ওধার হবার নয়! জানালা দরজা সীট কোথাও কিছু ভাঙাচোরা নেই।

সুপ্রিয়র ছেলে মেয়েরা বালক বালিকা; ভারতীয় কাউকে দেখলে তাদের জেগে ওঠে মহাআনন্দ, কারণ, বাবা যে তাদের ভারতীয়! কিন্তু ফরাসী ছাড়া আর কিছুই তারা বলতে পারে না। আমি বুঝতে পারছি, দারুণ কৌতূহল তাদের আমাকে দেখবার। আমি দেখবার বস্তুই বটে! কিন্তু, ঘরে ঢুকছে না। ওদেৎ চটপট তার গাউন পাল্টে শাড়ি পরে নিয়ে একেবারে ইণ্ডিয়ান লেডি বনে সামনে এল! দেখলাম, একটু মোটাসোটা হয়েছে, কিন্তু আগের মতোই লাজুক থেকে গেছে। অতিথির জন্যে স্পেশ্যাল খানা হাঁসের মাংস। ওদেতের নিশ্চয় মনে পড়ছে ষোল-সতের বছর আগে কলকাতায় আলিয়ঁস ফ্রঁসেজে তার একক চিত্রকলা প্রদর্শনীর প্রশংসা সূচক সমালোচনা লিখেছিলেন এই ভদ্রলোকই। হ্যাঁ, ওদেৎ তখন সত্যিই মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছিল। সে এখন আরও

অনেক অনেক পরিণত শিল্পী। পাবলিশার মহলে ওদেতের খুব নামডাক। ফ্রাঁসে পুস্তক অলঙ্করণের উদ্দেশ্যে ফাইন আরটিস্টদের ডাক পরে। শক্তির গৃহিনী দেলতেই-ও ইলাসট্রেশন করে। সত্যজিৎ রায়ের ফটিকচাঁদের ফরাসী অনুবাদের ছবি এঁকেছে দেলতেই! সুপ্রিয় বহুকাল পারীতে বাস করছে, বউ ফরাসী, ছেলে-মেয়েরাও ফরাসী, কিন্তু তার বাঙালীপনা যায়নি, রীতিমত জবরদস্তি করেই সে আমাকে গুচ্ছের খাওয়ালো, সুপ, ভাত, মাংস, সালাদ, ফ্রুড সালাদ আর যোগুর। ফেরার সময় আবার মেত্রো। কিন্তু তখন পাসপোর্ট সংগে নেই তো কি হয়েছে? আমি তো সংগে আছি—সে ভাবটা নেই। সুপ্রিয় খোঁজ নিল, "সেটা আছে তো?" আর সে ভুল হবে আমার?

পারী নগরীর সবচেয়ে বড় আকর্ষণ লুভ্‌র মিউজিয়াম, অন্তত আমার কাছে। একদা এক দুর্গ থেকে লুভ্‌রের রূপান্তর হয়েছে শিল্প সংরক্ষণাগারে। লুভ্‌র দুর্গের আদি বাড়ি ভাঙা গড়া হতে হতে বর্তমানে যা দাঁড়িয়েছে তাও কোনও মতেই সমকালীন স্থাপত্যের পরিচায়ক নয়! ৫০০ বছরেরও প্রাচীন লুভর গুরুগম্ভীর। সেখানে যে আরট সংরক্ষিত তাতে দেখা যাবে না কোনও ফাঁকিবাজি কিংবা ছ্যাবলামী। মিশরীয় কলা, গ্রীক ভাস্কর্য, রোমান ভাস্কর্য আর রণেসাঁস পেইন্টিং-এর আড়ৎ এই লুভ্‌র মিউজিয়াম। ফ্রাঁসের একেক রাজা সিংহাসনে বসেছেন আর লুভ্‌রের আরট ঐশ্বর্য উত্তরে-উত্তরে বৃদ্ধিলাভ করেছে। শেষে লুভ্‌র রূপায়িত হল পৃথিবীর সর্ব বৃহৎ শিল্প সংরক্ষণাগারে। তখন নেপোলিয়ান বোনাপার্ট ফ্রাঁসের সম্রাট। যখন নেপোলিয়ান হেরে গেলেন সম্মিলিত ইউরোপীয় শক্তির কাছে, বিজয়ী দেশেরা দাবী জানাল, সব ফেরত দিতে হবে, যা যা অপহরণ করা হয়েছে সব! উপায় নেই মহামূল্য বহু আরট বস্তু হারাতে হল, কিন্তু লুভ্‌র আজও পৃথিবীর সেরা।

আরক দ ত্রিয়ঁফ পেরিয়ে সাঁজেলিজে ধরে চলেছি। ঐতিহাসিক কত ঘটনার সাক্ষী এই সাঁজেলিজে। দুপাশের বাড়িগুলো মস্ত

মস্ত কিন্তু আধুনিকতার কোথাও কোনও ছোঁয়া নেই সেই সাবেকী আমলের চেহারায়। ও রাস্তায় অদ্ভুত এক আবহাওয়া, সাদামাটা বুদ্ধির মানুষও কিছুদিন ঘোরাফেরা করলে বুদ্ধিজীবী বনে যেতে বাধ্য। কত সাহিত্যিক কত বর্ণনা দিয়েছেন, আর না দেখেই সাঁজেলিজের কথা আওড়ান এমন ইন্টেলেকচুয়ালের সংখ্যাই বা কম কি? রাস্তাটি সম্বন্ধে দুর্দমনীয় কৌতূহল ছিল। ঐ রাস্তারই কোনও রেস্তোরাঁয় কিছুদিন আগেও জাঁ পল সারর্ত্র এবং তার বন্ধু ও সঙ্গিনী সিমন দ্য বোভোয়ারকে প্রতি সন্ধ্যায় দেখা যেত। কিন্তু এখন তা পাস্ট টেন্স।

এসে পৌঁছলাম প্লাস দ লা কঁকর্দে। গাটা একটু ছম ছম্ করে উঠল। লুই ষোড়শের বলিদান হয়েছিল ঐখানেই। শুধু লুই ষোড়শ? গিলোটিনের নিচে মাথা রেখেছিলেন তাঁর রাণী মারী আঁতোয়ানেৎ, মাদাম ডুবেরি, শারলৎ কোরদে, দাঁতোঁ প্রমুখের নাম ধরে ১৩৪৩ জন হতভাগ্য। জনগণ ক্ষেপে উঠেছেন! একটি অভিজাতকেও রেহাই দেবেন না! একদিকে অমার্জনীয় বিলাসিতার চরম চলেছে আর অন্য দিকে গরীবের দুর্দশার সীমা নেই! অবশ্যম্ভাবী ফল-বিপ্লব। বিপ্লবের বলি যে সব সময় দোষীরাই হন তা তো নয়, ইতিহাস বলে, বহু নির্দোষকেও প্রাণ হারাতে হয়েছে বিপ্লবীদের হাতে। লুই ষোড়শকে যখন গিলোটিনের মঞ্চে হাত দুটো মোড়ন্বা করে পিছনদিকে বেঁধে পায়ে হাঁটিয়ে তোলা হল, তিনিও সামনের বিপুল জনতাকে জানাতে চেয়েছিলেন চিৎকার করে, কি দোষে তাঁকে মেরে ফেলা হচ্ছে তা তিনি জানেন না। তাঁর একটিই দোষ—তিনি ফ্রাঁসের রাজা।

কঁকর্দ পেরিয়ে তুইয়েরীর বাগান। বাহারে বাগান। চারপাশের মূর্তি রোমান ভাস্কর্যের নকল। মাঝে মাঝেই একেকটি ফটকের মধ্যে দিয়ে এগুতে হচ্ছে, নিগ্রোরা পথের ধারে হাড়ের পুতুল, কাঠের পুতুল উবু হয়ে বসে বিক্রি করছে, দেখতে দেখতে

পৌঁছলাম প্রায় লুভ্রের সামনে। দর্শন পেলাম রদ্যাঁর জবরদস্ত গুটি কয়েক করম, তারপর মাইয়োলের। মাইয়োলের ভাস্কর্য সম্বন্ধে পুনশ্চ পারী প্রবন্ধে নীরদ মজুমদার মশাই উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। মাইয়োল কৃতী ভাস্কর অবশ্যই। আর যে সময়ের তিনি শিল্পী সে সময়ে ঐ ভলিউমের ওপর জোর দিয়ে সরল করা আকরের মাধ্যমে ভাবের ব্যঞ্জনা নিশ্চিত অভিনব—ভবিষ্যকালের ভাস্করদের সামনে এক নতুন পথের সন্ধান। মাইয়োলের কাজেও প্রাণের কমতি নেই, কিন্তু রদ্যাঁর মূর্তিগুলির পাশে মাইয়োলের রমণীরা যতই রসাল কাব্য উপস্থাপনা করুক না কেন, সমমর্যাদার অধিকারী নয়, এ বিশ্বাস আমার দৃঢ়। মাইয়োলের 'নদীর' পাশে কিছুক্ষণ বসে জিরিয়ে নিলে ভালই লাগে। যা বিশ্রাম, আগেই করে নেওয়া ভাল। লুভ্র মিউজিয়ামের মধ্যে একবার ঢুকে পড়লে বিশ্রামের কথা আর চিন্তাতেই আসবে না।

পৃথিবীর সব দেশের মানুষ গিয়ে জমা হন লুভ্রে। লোকে লোকারণ্য। ওদেশের মেয়েরা তো স্পর্শকাতর নয়, অসাবধানতা-বশতঃ গায় গা ঘষে গেলে তারা কিছুমাত্র বিরক্তি কিংবা উষ্মা প্রকাশ করে না। অবশ্য ইচ্ছাকৃত ভাবে গা ঘষায় বিপদ আছে! বেশির ভাগ দর্শক, যাঁরা ভারত থেকে গেছেন, জাপান থেকে গেছেন, আমেরিকা থেকে গেছেন, দেয়ালে তীর চিহ্ন দেখে দেখে সোজা গিয়ে পৌঁছান মোনালিসার ঘরে। মোটা কাচের ঢাকার মধ্যে অবস্থান করছেন মোনালিসা। তিন-তিনবার তিনি খোয়া গিয়েছিলেন, আর তিন-তিনবারই তাঁকে উদ্ধার করা হয়েছে, ফরাসী গোয়েন্দারা তো যে সে গোয়েন্দা নন। মোনালিসার ইতিবৃত্ত শোনা যাবে কানে হেডফোন লাগিয়ে, তার জন্যে দিতে হবে বাড়তি মূল্য, লুভ্রের প্রবেশ মূল্যের সঙ্গে তা ধরে নেওয়া হয় না। মোনালিসা দেখা হল; এবার ভেনাস দ মেলো গ্রীক ভাস্কর্য। ব্যস, হয়ে গেল লুভ্র দেখা, স্বদেশে ফিরে গিয়ে গর্ব করে বলা যাবে 'লুভ্র দেখে এসেছি'—এই

হল বেশির ভাগ দর্শকের কথা। জাপানীরা আবার দলে দলে লুভ্রের সামনে দাঁড়িয়ে ফটো তুলিয়েও নেন। ঐ হাজার হাজার দর্শকের মধ্যে মুষ্টিমেয় ব্যক্তি দিনের পর দিন অতিবাহিত করেন, সেকালের মাস্টারদের কলাকীর্তি যে কত উচ্চমানে গিয়ে পৌঁছেছিল তা হৃদয়ঙ্গম করতে। রণেশাঁস শিল্পের, চিত্রকলা এবং ভাস্কর্যের, সবচেয়ে বড় সংগ্রহ লুভ্র। মোনালিসার অত কদর, কারণ রনেশাঁসের এক প্রধান শিল্পী লিওনার্দো ও-ছবি এঁকেছেন। মিকেলাঞ্জেলো দারুণ বলিষ্ঠ শিল্পী, সে বিষয় কোনও সন্দেহ রাখি না, কিন্তু রনেশাঁসের মন্ত্র গ্রহণ করেও তিনি কিছুটা সরে যাচ্ছিলেন আদর্শ থেকে, যার প্রভাবে পরবর্তীকালের বারোক আর্টের হল সৃষ্টি। একেবারে খাঁটি রনেশাঁসের পরিচয় লিওনার্দো আর রাফেলের রচনা। রনেশাঁসের সূচনা হয় জিওত্তোর চিত্রকলায়। জিওত্তোর গুরু ছিলেন সিমাব্যু। সিমাব্যুর কাজে রনেশাঁসের কোনও লক্ষণ নেই, তাহলেও বিবর্তনটা ভাল ভাবে বোঝাবার জন্যে লুভ্রে রনেশাঁস যুগ শুরু হয়েছে সিমাব্যুর আঁকা ছবি দিয়ে, তারপর জিওত্তো; তারপর একে একে সব শিল্পী, যাঁরা ব্রতী হয়েছিলেন চিত্রকলায় মানবতার পুনরুজ্জীবনে, এঁদের আসন হয়েছে বিরাট এক প্রলম্বিত কক্ষে। এ ঘরে ভিয়েনীজ স্কুল, জিওরজিওন, ভেরোনীজ প্রমুখরাও স্থান পেয়েছেন। বারোক শিল্পী রুবেন্সের একটি স্বতন্ত্র ঘর। মারী দ ম্যাদিসির জীবনাবলম্বনে রুবেন্সের সব ক'টি রচনা। বিরাট বিরাট! ফ্রাঁসের প্রথম বুরবোঁ রাজ আঁরী চতুর্থর পত্নী মারী দ ম্যাদিসি, স্বামী নিহত হবার পর লুভ্র প্রাসাদ ছেড়ে বাস করবেন অন্য কোথাও মনস্থ করলেন, তৈরী হল নতুন প্রাসাদ, লুক্সেম্বুর্গ পালে। ঐ প্রাসাদ সাজাবার জন্যে প্রয়োজন হল রাজকীয় পেইন্টিং-এর। ফ্লেমিস আরটিস্ট রুবেন্সের যশ তখন সারা ইউরোপ ব্যাপী। ডাক পড়ল তাঁর। শিল্পী প্রাণ ঢেলে ছবি আঁকলেন। বর্তমানে লুক্সেম্বুর্গ থেকে নিয়ে এসে ওগুলি টানান হয়েছে লুভ্রে। যেমন

রঙবহুল ছবি তেমনি বাহারে আর চওড়া ফ্রেম। রুবেন্সের বৃহত্তম ছবি 'শেষ বিচার' কিন্তু লুভ্‌রে নেই, তা আছে মিউনিখের আল্টে পিনাকোঠেক শিল্পসংরক্ষণাগারে। বারোক শিল্পী ফান ডাইক, জরডীন, স্নিডার তারপর রেমব্রান্ট—এরাঁও গম্‌গমে করে রেখেছেন লুভ্‌রের আবহাওয়া। মাসের পর মাস দেখলেও লুভ্‌র দেখা শেষ হবে না, কিন্তু আমার হাতে আছে মাত্র কটা দিন। বার্লিনে দেখেছি মিশরীয় আর্টের স্বতন্ত্র মিউজিয়াম—নেফেরতিতি মিউজিয়াম। দারুণ সমৃদ্ধ সংগ্রহ। তা, বোধহয়, লুভ্‌রের মিশরীয় আরট বিভাগের তুলনায় অনেক ছোট। বাস্তবিকই অনবদ্য মিশরীয় আরট। হাজার হাজার বছর আগের মানুষের কলাবোধ দেখে স্তম্ভিত হতে হয়। লুভ্‌রের সংগ্রহে গ্রীক ভাস্কর্য ভেনাস দ মেলোই সব নয়, আছে অসংখ্য গ্রীক মূর্তি, সোমাথ্রাস যেন সবার ওপরে। যিশুখ্রীষ্টের পৃথিবীতে আবির্ভাব ঘটার বহু বহু বছর আগের সৃষ্টি সোমাথ্রাস সত্যিই বিস্ময়কর! অপূর্ব! সমকালীন অনেক ভাস্করেরই তো কাজ দেখলাম, ক্লাসিক গ্রীক ভাস্কর্যের সমতুল্য কিছু করতে পারবেন এমন জোর কী আছে কারোর মনে? সেকালের শিল্পী যে মানে পৌঁছেছিলেন, আমার তো বিশ্বাসই হয় না, একালের কোনও শিল্পীর পক্ষে তার কাছাকাছি যাবারও ক্ষমতা আছে। বড় কঠিন! ওখানে পৌঁছতে হলে যে সাধনার দরকার, সেই ধৈর্য, সেই একাগ্রতা আর আন্তরিকতা হারিয়ে ফেলেছি আমরা, একালের মানুষেরা। পথটা বড় দুর্গম বুঝতে পেরেই, বোধকরি, সমকালীন শিল্পী সহজ রাস্তার সন্ধানে আছেন, তাঁর মাথায় এসেছে ডিস্টরশন, অ্যাবসট্রাক্ট আইডিয়া এই সব। কিন্তু শর্ট কার্ট-এ আরটকে ছুঁয়ে ফেলা যায় না। পিকাসোভক্ত শিল্পী রবীন মণ্ডলকে বলেছিলাম, "আপনার আদর্শ শিল্পীকে মিকেলাঞ্জেলোর পাশে বসাতে পারবেন?" জবাব, "মিকেলাঞ্জেলোর কথা তুলছেন কেন? কোনও সমকালীন শিল্পীর নাম বলুন।" অর্থাৎ রবীন স্বীকার করেই নিল, যদিও একালের

সমালোচকেরা, প্রচারকেরা পিকাসোকে জগতের সেরা বলতে দ্বিধা করছে না, তা হলেও বিগতকালীন মিকেলাঞ্জেলোর পাশে আসন পাবার মত তিনি ছিলেন না। একালের শিল্পী দিশেহারা হয়ে পড়ছেন, মাথার ঠিক নেই, এলোমেলো সব কাজ করে বসছেন। পূর্ব বার্লিনের পেরগামাম মিউজিয়ামে টিটানদের সঙ্গে আটেনার লড়াই দেখার পর মনে হয়েছিল ভাস্কর্যের শেষ কথা বুঝি ঐখানেই, ওর ওপর আর কিছুই হতে পারে না। হতে অবশ্যই পারে, এবং তা করতে পারেন একমাত্র গ্রীক শিল্পীই। প্রমাণ—ঐ সোমাথ্রাস। বিজয় দেবী সবেমাত্র পা রেখেছেন নৌকার পাটাতনে, ডানা দুটি তখনও বন্ধ করার অবকাশ হয়নি। প্রকাণ্ড মূর্তি, কিন্তু দুঃখের বিষয় দেবীর মাথাটি গেছে খোয়া। যেমন আইডিয়া তেমনই রূপায়ণ! আর মুন্সিয়ানা? কোথায় পাব অমন নিখুঁত কাজ! আরট-এর এ যেন শেষ কথা!

এককাল থেকে অন্যকাল, এবং একেক কালের শ্রেষ্ঠ কীর্তিগুলি রসিকদের স্বীকৃতি লাভ করে চিরস্থায়ী বলে গণ্য হয়—এরই নাম ট্র্যাডিশন। ট্র্যাডিশন মানি না, মানবো না বললে চলে কখনও? বিমল ব্যানারজি খুব তেজস্বী ছেলে। বর্তমানে আমেরিকার নিউ-ইয়র্ক শহরে তার বাস। বেশ নাম করেছে। মার্কিণ শিল্পীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, হটে যায়নি। আমেরিকার সমকালীন শিল্পীরা ট্র্যাডিশনে বিশ্বাস করে না। তা করবে কী করে? তাদের দেশে কী সত্যিই কিছু ট্র্যাডিশন আছে? বিমলও ট্র্যাডিশনে বিশ্বাসী নয়। বিমল আমার খুব স্নেহভাজন। কিন্তু ওর সঙ্গে ভীষণ তর্ক হয়। সেও সরবে না তার যুক্তি থেকে, আমিও সরব না আমার থেকে। চিঠিতে প্রশ্ন করেছিলাম, "তুমি যা আঁকছ তা যদি আজ স্বীকৃত হয়, পরবর্তীকালে তা নিশ্চয় মানা হবে ট্র্যাডিশন বলে। তোমার যুক্তিমত ভবিষ্যতের শিল্পীদের কর্তব্য হবে তোমার আরট নস্যাৎ করে দেওয়া। তুমি কী নস্যাৎ হয়ে যাবার জন্যেই নক

নব আইডিয়া আর শৈলী উদ্ভাবনার উদ্দেশ্যে মাথার ঘাম পায় ফেলছ?" জবাব পাইনি। ট্র্যাডিশন আর ঐতিহ্য চিরস্মরণীয় করে রাখার প্রয়াসে কত ব্যবস্থাই না হচ্ছে ইউরোপের সব দেশে! আঁদ্রে মালরো মন্ত্রী হয়ে তো আইনজারিই করে দিলেন, যে ট্র্যাডিশন বহনকারী কোনও স্থাপত্য শিল্প ভেঙে ফেলে সেখানে মডার্ন আরকিটেকচর দাঁড় করান চলবে না। মডার্ন হতে চাও? যত খুশি হও ভেতরে, প্রাচীন সৌধের বহির্ভাগে কোনও পরিবর্তত ঘটালে তা হবে দণ্ডনীয় অপরাধ।

লুভ্‌রে সব সমেত বস্তু আছে ৪০০০০০টি। সবই যে ভাস্কর্য আর পেইন্টিং তা নয়, আছে টাপেস্ট্রি, আছে হীরা জহরত খচিত রাজমুকুট, আছে সৌখীন আসবাবপত্র, তৈজসপত্র এবং কিছু কবর। রাজামহারাজাদের কবরের কারুকার্যের জন্যে সেকালে ডাক পড়ত মহা মহা শিল্পীর।

এ ঘর সে ঘর ওপর নিচ করতে করতে যে কত কিলোমিটার হাঁটা হয়ে গেল তার কে হিসেব রাখবে? একদা এক দুর্গ থেকে লুভ্‌র রূপান্তরিত হয়েছে রাজপ্রাসাদে, তারপর আরট মিউজিয়ামে। স্থাপত্য শিল্পে লুভ্‌র অনবদ্য। কিন্তু কোথায় যেন কিছু গলদ! শিল্প সংরক্ষণার আদর্শে ও বাড়ি নির্মিত হয়নি। ওখানকার আলোর ব্যবস্থাও সমালোচনার উর্দ্ধে উঠতে পারে নি। আর পশ্চিম জার্মানীর আল্টে-পিনাকোঠেক, ডালেম কিংবা কুন্সঠালের সঙ্গে তুলনা করলে লুভ্‌রে বোধ করা যায় যত্নটা অনেক কম। ফ্রাংকোফিলরা একথা শুনলে আমাকে আস্ত রাখবেন না। অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করে আর বেশি সমালোচনা করব না। কিন্তু আমাদের দেশের মিউজিয়ামগুলোর কী হাল! কান্না পায়! লক্ষ লক্ষ মণিমুক্তা হীরা পান্না দিয়েও যার দাম উঠবে না এমন সব আরট বস্তুর কী শোচনীয়ই না অবস্থা, অযত্নে অবহেলায় তারা গড়াগড়ি খায়। ডিরেক্টর, কিউরেটর, সহকারী কিউরেটর, কর্মচারীর কোনও অভাব

নেই, অভাব শুধু উপযুক্ত যত্নের। সরকারী মিউজিয়াম হলে তো আর কোনও কথাই নেই, ডিরেক্টরের পদ সেখানে অতি উচ্চ, ফাইলের পর ফাইল সই করতে হয় তাঁকে।

পারী শহরে বহুত আরট মিউজিয়াম। বড় বড় মিউজিয়াম ছাড়া মাঝারি এবং ছোটখাট মিউজিয়াম সারা শহরেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। তার মধ্যে মুজে-গিমে হল ভারতীয় আরট সংরক্ষ-ণাগার। ছবি আর ভাস্কর্যের খরিদ্দারের কমতি নেই, অলিতে গলিতে আরট গ্যালারী। একদা নাম করা শিল্পীর মডেল, বর্তমানে কোনও গ্যালারীর মালিক এমন অনেক মহিলারই নাম শোনা যায়। ভাস্কর মাইয়োলের মডেল যাঁকে দেখে ঐ 'নদীর' রূপ কল্পনা করে-ছিলেন শিল্পী, বর্তমানে হয়েছেন আরট ডীলার। ভদ্রমহিলার সঙ্গে আলাপ করার সুযোগ আমার হয়নি। বোঝা যায় ছবি বেচার ব্যবসাটা পারীতে মহিলাদেরই নিয়ন্ত্রণে। কলকাতায় মাঝে মাঝেই আরট গ্যালারী গজিয়ে ওঠে আবার কিছুদিনের মধ্যেই উঠে যায়। খরিদ্দারের যে অভাব সে কথা বিশ্বাস হয় না। ও দেশের তুলনায় এদেশে ছবি কিননেওয়ালা কম, একথা অবশ্যই স্বীকার্য, তাহলেও গ্যালারী পরিচালকদের মধ্যেও কিছু গাফিলতি এবং অনভিজ্ঞতা নিশ্চয় আছে, যার জন্যে ব্যবসায়ে অচিরেই পড়ে পূর্ণচ্ছেদ। শিল্পী-রাও বড় বেশি আশা করে বসে থাকেন।

ববুর দেখেছি সুপ্রিয়র সঙ্গে, অদিতি কেন ছেড়ে দেবে? তার সাথে দ্বিতীয়বার ববুরে প্রবেশ করতে হল। পিকাসো আর কান-ডিন্‌স্কীর ছবি ভাল করে দেখলাম। আমার ধারণা না পাল্টে আরও হল বদ্ধমূল। পিকাসোকে যদি মডার্ণ বলা হয় তাহলে যে সব শিশুরা সুন্দর সুন্দর পুতুল হাতে পড়লেই আছড়ে, পিটিয়ে ভেঙে বিকৃত করে ফেলে তাদেরও তো মডার্ণ আর্টিস্ট বলতে হয়। পিকাসোর ছবি ক্লাসিক ফরমের দোমড়ান মোচড়ান অবস্থা ছাড়া আর কি? ঐ দোমড়ান মোচড়ানর মধ্যে বাহাদুরি আছে বৈকি!

কিন্তু যা ছিল এবং যা আছে তা সম্পূর্ণ ভাবে মন থেকে ঝেড়ে ফেলে কিছু সৃষ্টি—তা তো দেখি না।

পাশেই ব্রাঁকুসী স্টুডিও। ব্রাঁকুসী অবশ্যই ও স্টুডিওতে কোনও দিন কাজ করেন নি। ব্রাঁকুসীর মূল স্টুডিওর হুবহু নকল করে স্টুডিওটি তৈরী হয়েছে; ব্রাঁকুসীকৃত সব ভাস্কর্য ওখানে সংরক্ষিত। ব্রাঁকুসীর মৌলিকতা অনস্বীকার্য। তাঁর মস্ত বড় চকচকে ডিমটি ঘরে ঢুকতেই চোখে পড়বে। ঐ ডিম্বই আমাদের প্রদোষ দাশগুপ্ত মশাইকে অনুপ্রাণিত করেছে ডিম্বাকার ভাস্কর্যের কথা চিন্তা করতে। কথাটি প্রদোষবাবু নিজেই বলেছেন কোনও বক্তৃতায়। উনি অবশ্য আরও কিছু যোগ দিয়েছেন, ডিমের ভিতরের প্রাণটুকুরও উনি রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন। ব্যাপারটা না দেখলে এবং বুঝিয়ে না দিলে ধরা মুস্কিল। পিকাসো তো শুধুই ছবিতে ভাঙাচোরা করেছেন, ববুরে কিছু ভাস্কর্য আছে যা সত্যি সত্যিই নানা কলকজা হাইড্রোলিক প্রেসের চাপে বিকল করে চেপ্টে চুপ্টে আরট বলে দাবি করা হয়েছে। ব্যারনার গগ্যাঁর সিনথেটিসম ছিল আজকের আভাঁ-গার্দ আর্টের আদিপর্ব। কিন্তু গগ্যাঁর যদি দূরদর্শিতা থাকত, আর যদি গগ্যাঁ—সমর্থক সমালোচক মরিস দেনিসের ব্যাখ্যা—'কিছু রঙিন ফরমের দৃষ্টি সুখকর আসজ্ঞনই হল আরট' ছাপার হরফে না তুলে রাখা হত, তাহলে বোধ করি সমকালীন আর্টের রূপ হত অন্য রকম। গগ্যাঁ আর মরিসের আত্মারা আজকের ব্যাপার-স্যাপার দেখে নিশ্চয় ভাবছে 'কি পাপই না করেছি!' এ আরট সমকালীন হতে পারে কিন্তু চিরন্তন নয়। আরটে মৌলিকতা নিশ্চয় থাকবে, কিন্তু চিরন্তন কিছু করতে হলে ট্র্যাডিশনের পথ না ধরে গতি নেই!

ঘুঘুপাখি যে পোষার পাখি তা জানলাম পারিতে গিয়ে, অদিতিদের শোবার ঘরে একজোড়া ঘুঘু পাখি জানলার ধারে মস্ত খাঁচায় দিব্যি আনন্দে কুরর কুরর করে ডাক দিয়ে আগন্তুককে জানিয়ে দেয় তাদের উপস্থিতি। সন্তান সন্ততিও অনেক হয়েছে,

কিন্তু বেশি ঘুঘুর ভিড় ফ্রেদির পছন্দ নয়, যতবারই ডিম ফুটে বাচ্চা হয়, শুধু কর্তা-গিন্নী রেখে সে ওগুলোকে বিদেয় করে দেয়। ঘুঘুর খাবার কিনতে গেল অদিতি, সঙ্গ নিলাম আমি। মস্ত দোকান। কুকুর, বিড়াল, হাঁস, পায়রা—কি নেই! চেখে পড়ল আট দশটি ময়না পাখির ওপর খাঁচায় কাগজ সেঁটে লেখা আছে 'ভারতীয় ময়না, যে পাখি কথা বলে।' দাম শুনবেন? সাড়ে তিন হাজার ফ্রাঁক একেকটির। টাকার হিসেবে দাঁড়ায় প্রায় সাত হাজার। মনে মনে ভাবলাম দেশ থেকে গুটি কয়েক ময়না সঙ্গে নিয়ে এলে মন্দ হত না। আরকটা কথাও ভাবলাম, ভারতীয়দের মধ্যে একমাত্র ময়নারই ওখানে খাতির।

পারীকে উঁচু থেকে দেখা দরকার—তুর এইফেল থেকে দেখব? না তুর মঁপারনাস থেকে দেখব? তুরমঁপারনাস এক মস্ত লম্বা বাড়ি, নিউইয়র্ক শহরের স্কাই স্ক্রেপারের মতো। তুরমঁপারনাসেই উঠলাম, লিফট-এ চড়ে। এইফেল টাওয়ারের মতো অত উঁচু না হলেও উচ্চতায় তুর মঁপারনাস শহরে দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী। পারী নগরীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত সর্বোচ্চতলা থেকে গোচরে ধরা পড়ে। কটকটে রোদ্দুর তখন, মনে হল খেলাঘরের শহর দেখছি, সব চেনা যাচ্ছে—নোত্রদাম গীর্জা, লুভ্‌র মিউজিয়াম, পালে দু জুসতিস, পালে লুক্সেমবার্গ—সবই, কিন্তু কত ছোট ছোট। প্রত্যেকটি বাড়িই এক রঙা, বহু রঙা শুধু ববুর আরট গ্যালারী। ধোঁয়ার কোনও চিহ্ন নেই। কলকাতা শহর যদি অত উঁচু থেকে দেখা যায়, বোধকরি শতকরা পচাঁত্তর ভাগ শহরটাই ধোঁয়ায় ঢাকা পড়ে থাকবে। এইফেল টাওয়ার দেখছি বাতো-মুশে চেপে। সেইন নদীতে বাতো-মুশে বেড়ান ভারি আরামের। কিন্তু কোনও পুলের নিচে দিয়ে নৌকা যাবার সময় সাবধান, ওপর থেকে বদ ছোকরারা থুথু ফেলতে পারে। তারা যতসব অসভ্য ইঙ্গিতও করে। বে-আদব ছেলের দল সব দেশেই আছে। পারীর মতো সভ্য শহরেও তাদের সংখ্যা

নেহাত কম নয়।

তুর এইফেল, যেমন আকাশচুম্বী তার উচ্চতা (৩০০ মিটার) তেমনই হয়েছে প্রচার। মঁসিও এইফেল ছিলেন এক মস্ত ইঞ্জিনিয়ার। ইঞ্জিনিয়ারিং কীর্তি হিসেবে তুর এইফেল অনবদ্য, অন্তত যে সময় এটি তৈরি হয়েছিল। কিন্তু বুদ্ধিজীবীরা সে সময় বিভীষিকা দেখলেন। আরটের সঙ্গে এর কী কোনও সম্পর্ক আছে? সবটাই লোহালক্কড়। কী দরকার ছিল এমন একটা কিম্ভূতকিমাকার ব্যাপারের? প্রতিবাদ পত্রে দস্তখত করেছিলেন প্রায় ৩০০ জন সেরা সেরা বুদ্ধিজীবী—গুণো, দুমা, মঁপাসাঁ, ল কঁত দ লীল, ফ্রঁসোয়া কোপে, কত নাম বলব? আবার মঁসিও এইফেল বাহবাও পেলেন সমান সমান, আপোলিনের, কোকতো, পিসারো, দুফী, উত্রিও, সোরা, মারকে প্রমুখ কবি, সাহিত্যিক আর চিত্রকরদের কাছ থেকে অনন্যসাধারণ ইঞ্জিনিয়ারিং বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে।

২৮শে সেপ্টেম্বর ১৯৮১। সকালে চা পর্ব শেষ করে বসেছি বাক্স প্যাঁটরা গুছোতে। ফোন বেজে উঠল। শক্তি বর্মন ফোন করেছে। "আজকেই ফিরে যাচ্ছেন?" "হ্যাঁ!" "কি কি দেখলেন পারীর?" একটা ফিরিস্তি দিলাম। "তা হলে তো সবই দেখা হয়েছে, বাকী শুধু—ওটা পরের বারের জন্যে থাক।" শক্তি কিছু স্থূল শব্দ উচ্চারণ করেছিল, তা এখানে উহ্য রাখলাম।

বাঁধাছাদা সব প্রস্তুত। অদিতি আর ফ্রেদি আমার ব্যাগ আর বাক্স তুলে নিল। প্রথমে মেত্রো, তারপর ট্রেন, তারপর বাসে চেপে পৌঁছলাম দগল এয়ারপোর্টে। ওরা তো ফিরে গেল বেলা ১১টা নাগাদ, আমাকে বসে থাকতে হল ৪ নম্বর স্যাটিলাইটে ৬ ঘণ্টার মত। এরোফ্লোটের ইলুশীন প্লেনে চেপে যাব মস্কো। উড়োজাহাজ বুঝি খারাপ হয়ে গেছে, সারান হচ্ছে। প্লেন যাত্রীদের নিয়ে মাটি ছাড়ল সন্ধ্যায়, যখন মস্কো পৌঁছলাম তখন রাত প্রায় ১১টা। মস্ত কাহিনী মস্কো অভিজ্ঞতা। তা বলব পরে।

# মুজে লুভ্‌র

রাজা ফিলিপ্‌ অগস্ত ১২০০ সালে একটি দুর্গ তৈরী করিয়েছিলেন লেপুরায়। শহর পারীর নিরাপত্তার জন্যে দুর্গটির প্রয়োজন ছিল। সেই দুর্গটিই বর্তমানে পারীর লুভ্‌র আর্ট মিউজিয়াম। লেপুরা সম্ভবত লুভ্‌র শব্দের মূল। কত কাণ্ডই না হয়ে গিয়েছে ঐ দুর্গে, কত হত্যা, কত রক্তপাত। আজ তা সুবিশাল শিল্প সংরক্ষণাগার—যার নাম পৃথিবীতে এমন শিল্পামোদী নেই যে শোনেনি।

শহরের যেটি রাজপ্রাসাদ ছিল, রাজারা বংশপরম্পরায় সেইখানেই বাস করতেন, কিন্তু শার্ল পঞ্চম প্রাণভয়ে এসে আশ্রয় নিলেন লুভ্‌র দুর্গে। সওদাগর এতিয়েনের ঘাতকরা পিছু নিয়েছে তাঁর। শয়নকক্ষের মধ্যে তাঁরই সামনে তাঁর দুই দেহরক্ষী খতম হয়ে গেল। কোন সাহসে শার্ল আর ঐ ভয়ঙ্কর প্রাসাদে থাকবেন? লুভ্‌রে এসে রাজা শার্ল দুর্গটিকে আরও নিরাপদ করে নিলেন কিছু অদলবদল করে। রাজা থাকবেন যে বাড়িতে তা তো রাজবাড়ির মতন করেই সাজাতে হবে, বড় বড় ভাস্কর্য, রাজরমণী রাজপুরুষদের মূর্তি নিয়ে এসে বসান হল সিঁড়ির দুপাশে। জাঁকজমকে ভরে উঠল লুভ্‌র ধীরে ধীরে। রাজার ঘরে, রাণীর ঘরে টাপেস্ট্রি দিয়ে মুড়ে দেওয়া হল দেওয়াল। সে সময়ে টাপেস্ট্রি আরট-এর সুসময় চলেছে। টাপেস্ট্রি না থাকলে সে বাড়ি রাজবাড়ি বলে মানাবেই না। এনামেল করা টালি দিয়ে মেঝে তৈরী হল, জানালা-দরজায় স্টেইণ্ড গ্লাসের শার্শি বসল। কারুকার্য করা আসবাবপত্রে সারা বাড়ি ভরে গেল। জার্মান সম্রাট চার্লস চতুর্থের মত রাজাও লুভ্‌রের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন, "রাজ-আবাস বটে এই লুভ্‌র…।" দুর্গের বহু মিনারের একটিতে পর পর তিন তলায় রাখা কেবল বই—নানা বিষয়ের, নানা চেহারার। লাল রং করা আর সোনালী কাজ করা কাঠের সিন্দুকের মধ্যে থাকতো ঐ সব কেতাব। রাজামশাই রাজকর্ম সেরেসুরে এসে ঢুকতেন তাঁর প্রিয় লাইব্রেরীর ঘরে। শাঁদলিয়েরে অসংখ্য মোমবাতির রোশনিতে ঘর করত ঝলমল। দেয়ালে নানান ছবি—মাস্টার পেইণ্টারদের চিত্রকলা। যেমন সৌখীন তেমনই পণ্ডিত ছিলেন রাজা শার্ল পঞ্চম। রাজা মারা গেলেন ১৩৮০ সালে। লুভ্‌রের যত্ন কমে গেল। দেশে তখন খুব ডামাডোল, ঐতিহাসিক শতবর্ষ ব্যাপী যুদ্ধ চলেছে। লুভ্‌রে বাস করাটা পরবর্তী রাজারা নিরাপদ নয় মনে করে ওতেল দ তুরনেল-এ ঘর সংসার তুলে নিয়ে গেছেন। ১৪০ বছর এই অবস্থা

চলল। ১৫০০ সাল নাগাদ লুভ্‌র প্রায় বিস্মৃতই হয়ে গিয়েছিল। রাজা প্রথম ফ্রাঁসোয়ার বাসনায় তা আবার রাজপ্রাসাদের মর্যাদা ফিরে পেল ১৫২৭ সাল থেকে। খোল-নলচে পাল্টে দুর্গটিকে নতুন চেহারায় দাঁড় করান হল—অনেক কিছু ভেঙ্গে ফেলা হল, অনেক কিছু গড়ে তোলা হল। স্থপতি পিয়ের লেসকোর পরিকল্পনা মত সব কাজ চলছে। লিওনার্দো দা ভিঞ্চির মোনালিসা, সেই সঙ্গে তিজিয়ানো আর রাফেলের আঁকা ছবি শোভা পেতে থাকল রাজার সাধের চিত্রশালায়। এলো রোমান অ্যান্টিক, এলো ওরিয়েন্টাল কিউরিও।

পিয়ের লেসকোর কাজ খুব বেশী দূর এগোবার আগেই ফ্রাঁসোয়া মারা গেলেন। দ্বিতীয় অঁরী রাজা হলেন। লুভ্‌রের রূপে তখন রনেসাঁস স্থাপত্যকলা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আরট ঐশ্বর্য বাড়িয়ে তোলায় অঁরীর কোন আগ্রহ নেই, খেলাধুলা নিয়ে তিনি মগ্ন হয়ে থাকেন। তবে ফ্রাঁসোয়ার ইচ্ছা মত লুভ্‌রের অদল-বদল আর নক্সা করায় অঁরীর কোনও আপত্তি ছিল না, পিয়ের লেসকো কাজ করে যেতে লাগলেন।

দারুণ ঘোড়সওয়ার ছিলেন অঁরী। কন্যা এলিজাবেথের বিবাহ-উৎসব উপলক্ষে ঘোষণা হয়েছে ঘোড়দৌড়ের প্রতিযোগিতা হবে। রাজা স্বয়ং নাম দিলেন প্রতিযোগিতায়। সেই শেষ অঁরীর ঘোড়ায় চড়া। শোচনীয় ভাবে মৃত্যু ঘটল তাঁর ঐ প্রতিযোগিতায়।

পরবর্তী রাজা দ্বিতীয় ফ্রাঁসোয়া। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। এবার রাজা হবার পালা নবম শার্ল-এর। কিন্তু নবম শার্ল নাবালক। অভিভাবক হয়ে রাজমাতা কাতরীন দ ম্যাদিসি রাজদণ্ড ধরলেন নিজ হাতে। কাতরীনের ইচ্ছা লুভ্‌র সন্নিকটে তুইয়েরী দুর্গ তৈরী করিয়ে অভিশপ্ত লুভ্‌র ত্যাগ করবেন। পুত্রকে নিরাপদে রাখতে চান কাতরীন। কিন্তু এক জ্যোতিষীর—ভবিষ্যদ্‌বাণী, রাণী কাতরীনের মৃত্যু অনিবার্য যদি তিনি

তুইয়েরীতে বাসা বদলান। ব্যস, থেমে গেল সব। তুইয়েরী রইল অর্ধসমাপ্ত। বাইশ বছর ঐ ভাবে পড়ে থাকল তুইয়েরী।

অঁরী চতুর্থ লুভ্‌র সিংহাসনে বসেছেন। বাইশ বছরে অনেক ঘটনা ঘটে গেছে। ভোলয়া রাজবংশের শেষ প্রতিনিধি অঁরী তৃতীয়র আততায়ীর হাতে প্রাণান্ত ঘটেছে। ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে লড়াই; অনেক হত্যা, অনেক দলাদলি, অনেক পরিবর্তন। নাভারের রাজা অঁরী চতুর্থ সুযোগ পেয়েছেন লুভ্‌র সিংহাসন দখল করার। এ রাজা বুরবোঁ বংশজাত। লুভ্‌রের উত্তরাধিকারীরা ভোলয়া। কিন্তু দারুণ চালাক আর শক্তিশালী রাজা অঁরী চতুর্থকে হটাবে কে সিংহাসন থেকে? মনেপ্রাণে তাঁকে রাজা বলে মেনে নিতে না পারলেও পারীবাসীরা চুপচাপ রইলেন। ব্যাপারটা অত সহজে চাপা পড়ার নয়, অঁরীর দিন ঘনিয়ে এসেছিল, ১৬১০ সালে, ১৪ মে অঁরীকে হত্যা করা হল লুভ্‌রের মধ্যেই। অঁরীর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী মারী দ ম্যাদিসির ন বছরের ছেলে লুই ত্রয়োদশ সিংহাসনে বসল। কাতরীনের মত মারীও নাবালক পুত্রের হয়ে রাজকার্য চালিয়ে যেতে লাগলেন। লুভরের আরট সংগ্রহ একটা একটা করে বেড়ে চলেছে। স্বামী মারা যাবার পর মারীর লুভ্‌রে থাকতে মন চাইছিল না, তিনি বহু অর্থ ব্যয় করে লুক্সেমবুর্গ প্রাসাদ তৈরী করালেন। রুবেন্স-এর তখন রবরবা সারা ইউরোপে। রাজা-মহারাজা মহলে সবার মুখে মুখে তখন ঐ ফ্লেমিশ মাস্টার শিল্পী রুবেন্সের নাম। মারী দ ম্যাদিসির কাছ থেকে আমন্ত্রণ এল রুবেন্সের কাছে, লুক্সেম-বুর্গ প্রাসাদে ছবি অঁাকতে হবে। মারীর জীবনের স্মরণীয় ঘটনা-গুলি অঁাকা হল। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অয়েল পেইন্টিং মোট চব্বিশটি। ঐ চব্বিশটি ছবি পরে কোনও সময়ে লুভ্‌রে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। সে যে কত বড় বড় ছবি আর কি যে তার রংবাহার না দেখলে বিশ্বাস করা অসম্ভব। কেতাবে যে সব ছোট ছোট প্রিণ্ট দেখা যায় তা থেকে রুবেন্স-এর রচনার মেজাজ বোঝা যাবে না।

লুভ্‌রে ২০০টি মহামূল্য চিত্রকলা জমা হয়েছে। লুই ত্রয়োদশ সাবালক হয়ে রাজার রাজ-দায়িত্ব হাতে নিয়েছেন। লুভ্‌রের কুর কারে তৈরী হল রাজার হুকুমে। রাজ-স্থপতি তখন লম্যারসিয়ের। লুই ত্রয়োদশের পর লুই চতুর্দশ। পারী শহরের বাইরে ভরসাই গ্রাম। লুই ত্রয়োদশ ছোট্ট দুর্গ তৈরি করে রেখেছিলেন সেখানে। মাঝে মাঝে শিকার-টিকার করতে যেতেন। ঐ দুর্গটি ক্রমশঃ রূপ নিল প্রাসাদের। লুই চতুর্দশ লুভ্‌র ছেড়ে রইলেন গিয়ে ভরসাই-এ। লুভ্‌রে এর মধ্যে আড়াই হাজার ছবি সংগ্রহ হয়েছে। মাঝে মাঝে, একটি ঘরে পেইন্টিং আর ভাস্কর্যের প্রদর্শনী হয়। কিছু আর্টিস্টকে আশ্রয় দেওয়া হয়েছে, খাওয়া-দাওয়া রাজ-দরবারের খরচ। আর্টিস্টদের কাজ, অন্য কোনও কথা না চিন্তা করে, শুধু শিল্প সৃষ্টি করে চলা। প্রাসাদ ভরসাই জমজমাট হয়ে উঠল, লুভ্‌র পড়ে রইল তার শিল্পসম্ভার নিয়ে রাজ পরিত্যক্ত অবস্থায়। যে সব ঘরে একসময় রাজরাণীরা রাত্রিযাপন করেছেন সেখানে বসেছে আরট অ্যাকাডেমির ক্লাস। ছাত্রদের খুব সুবিধে। যেদিকে ফেরা যায় সে দিকেই মাস্টার শিল্পীদের ভাস্কর্য আর পেইন্টিং। ১৭২৫ সাল থেকে কারে সালোঁ-য় সমকালীন কলা প্রদর্শনী হতে থাকল নিয়মিত। সেই থেকে সালোঁ শব্দের অর্থ হয়ে পড়ল প্রদর্শনী। লুভ্‌রের অনেক ঘর, বিজ্ঞান একাডেমিই বা দু একটা ঘর দখল করবে না কেন? বিভিন্ন সরকারী দপ্তরও ক্রমশঃ ফাইল-পত্র জমা করতে লাগল কোনও কোনও ঘরে। কিন্তু বাড়াবাড়ি হয়ে গেল, যখন বেশ কিছু ভিখিরি ঢুকে পড়ল খালি ঘর পেয়ে। ওভাবে লুভ্‌র বেওয়ারিশ হয়ে পড়ে থাকবে সেটা কোনও মতেই সমর্থনীয় নয়, কর্তৃপক্ষ তখন সিদ্ধান্ত নিলেন—হটাও সব ওখান থেকে। ১৭৯৩ সালে সব বিতাড়িত, আরট অ্যাকাডেমিসুদ্ধ।

রোম শহরে কাপিতল মিউজিয়াম সৃষ্টি হয়েছে, লুক্সেমবুর্গ প্রাসাদ মিউজিয়ামের মতই—জনসাধারণের জন্যে সপ্তাহে দুবার

করে খুলে দেওয়া হয়, রুবেন্স এবং আরও বহু আর্টিস্ট-এর ছবি দেখার জন্যে আসেন দলে দলে শিল্পরসিকরা। লুভ্রকে জাতীয় মিউজিয়াম করলে কেমন হয়? ভাবলেন লুই ষোড়শ।

মিউজিয়াম হিসাবে লুভ্রের ইতিহাস শুরু হল। কিন্তু যতই ভুলে যাবার চেষ্টা হোক না কেন, লুভ্রে ফরাসী রাজরাণীদের আত্মা সদাই প্রতীয়মান। শার্ল পঞ্চমের প্রাসাদ—ফ্রাঁসোয়া প্রথম, অঁরী দ্বিতীয়, অঁরী চতুর্থ, লুই ত্রয়োদশ, লুই চতুর্দশ, কাতরীন দ ম্যাদিসি, মারী দ ম্যাদিসি, আরও কত রাজপুরুষের, রাজরমণীর ছোঁয়া লেগে আছে সারা বাড়িটিতে। শুধুই কী রাজা রাণীরা? কত ভৃত্য, কত দাসী, কত কর্মচারী আর সেই সঙ্গে রাজপরিবারের পরিজনবর্গের আনাগোনায় একদা জাঁকজমকে জমজমাট সেই প্রাসাদ আজও যেন রাজবাড়িই।

ফরাসী ইতিহাসে আরও কত ঘটনা ঘটে গেল। রাজরক্তের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, ১৭৮৯-এ বাসতীয় দুর্গ অধিকার, ১৭৯২-এ তুইয়েরী রাজপ্রাসাদ আক্রমণ এবং তার ধ্বংস, সেপ্টেম্বরের হত্যালীলা, রাজশাসনের অবসান তারপর লুই ষোড়শের গিলোটীন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত। ষোড়শ লুই পরিকল্পিত মুজে লুভ্রের দ্বারোদ্ঘাটন হল হতভাগ্য লুইকে মেরে ফেলার প্রায় আট মাস পরে। দিনটি কোনও কোনও কেতাবে পাওয়া যায় ১৮ই নভেম্বর ১৭৯৩, আবার অন্য জায়গায় ১০ই অগস্ট ১৭৯৩। কোনটি ঠিক? ১৭৬৮ সালে লুভ্র অট্টালিকার সুপারিনটেনডেন্ট মঁসিও দ মারিণী লুভ্রকে মিউজিয়ামের রূপ দেবার খসড়াটি লুইয়ের সামনে রাখেন; ১৭৯১ সালে লুই ধরা পড়লেন বিদ্রোহীদের হাতে; লাল কাপড় কানের ওপর দিয়ে জড়িয়ে টেনে ধরে জনতা রাজাকে জাতির প্রতি আনুগত্য স্বীকার করতে বাধ্য করল; তারপর ছ শ' সুইস গার্ডের নিধন এবং রাজবাড়ি দখল। তাতেও নিস্তার নেই, লুইকে তোলা হল গিলোটিনের মঞ্চে ১৭৯৩ সালের জানুয়ারী মাসে।

লুভ্রের নাম রাখা হয় কেন্দ্রীয় শিল্প সংরক্ষণাগার। গণতন্ত্রী সৈন্যবাহিনীর এক অফিসার ধাপে ধাপে উন্নতি করে চলেছেন, শেষে জাতীয় পরিচালন সংসদের পাঁচ সদস্যের একজন নির্বাচিত হলেন তিনি। তাঁর পিছনে সমর্থন প্রচণ্ড, অন্য চারজন ডিরেক্টরদের ডিঙিয়ে তিনি হলেন প্রধান—পরে ফ্রাঁসের সম্রাট—নাপলেওঁ বোনাপার্ত। নাপলেওঁর অভিষেক-অনুষ্ঠান সম্পন্ন হল নত্রদাম-গীর্জায়। লুভ্রের নাম পাল্টে রাখা হল মুজে নাপলেওঁ। অনুপ্রবেশকারী তখন প্রত্যেকটি বিতাড়িত। নাপলেওঁর রাজত্বে কার সাধ্য তাঁকে অস্বীকার করে? দোর্দণ্ড প্রতাপ তাঁর। তৈরী হল লুভ্রে ঢোকার মুখে আর্ক দু করুজেল। কাছেই সাঁ নিকেজ সড়কে নাপলেওঁর ওপর রাজপরিবারের সমর্থকদের যে আক্রমণ প্রতিহত হয় আর্ক করুজেল সেই লড়াইয়ের বিজয়-স্তম্ভ। অসমাপ্ত কুর কারে সমাপ্ত হল নাপলেওঁর স্থপতি প্যারসিয়ের আর ফন্তাইনের তত্ত্বাবধানে। লুভ্রের প্রত্যেকটি কক্ষ নতুন করে সাজাবার হুকুম হয়েছে, এক্সপার্টরা এসে ঠিক করছেন কোনখানে কোন ভাস্কর্য রাখা হবে, কোথায় কোন ছবি থাকলে তা যথোচিত মর্যাদা পাবে। সালোঁ কারে সজ্জিত হল নানান বাহারে, মারী লুইজের সঙ্গে সম্রাটের শাদি হল ঐ ঘরে।

মহাবীর নাপলেওঁ জয় করেছেন একটার পর একটা দেশ আর সেই সব পরাজিত দেশের সেরা সেরা চারুকলা তুলে নিয়ে এসে সাজিয়েছেন লুভ্রে। লুভ্রের সমকক্ষ শিল্প সংরক্ষণাগার আর দ্বিতীয় নেই তখন সারা পৃথিবীতে। খরিদ করাও হয়ে চলেছে একটার পর একটা মূর্তি, চিত্রকলা আর কৌতূহলোদ্দীপক ছোটখাট হাতের কাজ দেশ বিদেশ থেকে। আর্টের প্রতি নাপলেওঁর প্রগাঢ় ভালবাসা আর শ্রদ্ধার পরিচায়ক তাঁর সময়ে সমৃদ্ধ লুভ্র। লুভ্রকে ঢেলে গোছান হয়েছে। লুভ্র প্রাসাদের দুই বাহুর মধ্যের মাঠ—যে মাঠে এক সময়ে হয়েছে সৈন্য-কুচকাওয়াজ ক্রীড়া

প্রতিযোগিতা আর উৎসব—পরবর্তীকালে জগৎশ্রেষ্ঠ আরট মিউজিয়ামের উপযুক্ত বাগিচায় পরিণত হল তা।

নাপলেওঁ সম্রাট হয়ে দশ বছর রাজত্ব করেন। ১৮১৪ সালে ফ্রাঁসবিরোধী সংঘবদ্ধ শক্তি দখল করল পারী নগরী। আরও প্রায় ছ বছর নাপলেওঁ বেঁচেছিলেন। উনিশ বছর পর ১৮৪০ সালে তাঁর মৃতদেহ, রাজা লুই ফিলিপের চেষ্টায় ইংল্যাণ্ড থেকে পারী শহরে নিয়ে আসা হয়। আশ্চর্য, উনিশ বছর সমাধিস্থ থাকা সত্ত্বেও মৃতদেহটি একটুও নষ্ট হয়নি। দ্বিতীয়বার তাঁকে সমাধিস্থ করা হল পারীতে একটির ভিতর আরেকটি করে পর পর ছটি কফিনের মধ্যে রেখে। যে সব দেশ জয় করে নাপলেওঁ মূল্যবান চারুকলা জমা করেছিলেন সম্রাটের পরাজয়ের পর বিজিত ফ্রাঁসের ওপর চাপ পড়ল যা যা আনা হয়েছে সব ফেরত দিতে হবে।

মধ্যে বুরবোঁ রাজবংশ আবার ক্ষমতায় আসীন হন, দ্বিতীয় গণতন্ত্র গড়ে ওঠার আগে পর্যন্ত লুভ্‌র সংগ্রহে বুরবোঁ রাজারা নতুন কিছু সংযোজনও করেছিলেন। স্থানীয় স্মৃতিস্তম্ভ মিউজিয়ামটি বন্ধ করে দেওয়া হল এবং সেখানকার সব ভাস্কর্য নিয়ে এসে জমা করা হল লুভ্‌রে। ফঁরাসী আঙিনায় আরও বার দুয়েক রাজনৈতিক দৃশ্য পরিবর্তন ঘটে বটে কিন্তু লুভ্‌র মিউজিয়াম রাজনীতির উর্দ্ধে থেকে জগতের সেরা শিল্প-সংরক্ষণাগারের তালিকায় নিজ স্থানটি হারায়নি কখনও।

প্রতিদিন লুভ্‌রে আসেন অসংখ্য দর্শক, সরকারী হিসাবে, প্রতিবছর তিরিশ লক্ষ। এঁদের মধ্যে থাকেন ইউরোপীয়রা, সেই সঙ্গে জাপানী, চীনা, কাফ্রী, ভারতীয়—পৃথিবীর সব দেশের মানুষ। কে কোন্ দেশের বাসিন্দা শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে থেকে চিনে বের করা মুশকিল, সবারই এক ধরনের চেহারা, এক ধরনের পোশাক-আশাকে এক ধরনের হাবভাব। কিন্তু জাপানী কিংবা চীনা কিংবা কাফ্রীদের চিনতে একটুও অসুবিধা হয় না—তাঁরা যতই ব্লু জীন আর লেদার

জারকীন পরিধান করুন না কেন। জাপানীদের বেশী উৎসাহ; তাঁরা দলে দলে আসেন লুভ্র দেখতে। শুধু লুভ্র দেখাটাই নয়, লুভ্রের সামনে দাঁড়িয়ে গ্রুপ ফটো তোলা অবশ্য কর্তব্য। দর্শকদের প্রথম লক্ষ্য মোনালিসা। তীর চিহ্ন দেখে দেখে মোনালিসার ঘরে পৌঁছে যান সোজা, সেখান থেকে যেতে হবে কুর কারেতে ভেনাস দ মিলোর সামনে—হয়ে গেল লুভ্র দেখা।

বেরোবার মুখে, উপায় নেই, বিরাট পরী মূর্তি দুটি ডানা মেলে দর্শককে পিছু ডাকছেন। তার সামনে কিছুক্ষণ অবশ্যই কাটবে। এটি এক বিজয়-স্মারক ভাস্কর্য। পাথরের। গ্রীসের সামোথ্রাস দ্বীপে পাওয়া গেছে। ঐতিহাসিকরা বলছেন খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে এক নৌ যুদ্ধে রোডিয়ানদের জয়ের পর এই মূর্তিটি সৃষ্টি হয়েছিল। গ্রীক ভাস্কর বিজয়-দেবীকে সব সময় ডানা বিশিষ্ট রমণীর রূপেই কল্পনা করতেন। মূর্তির ভঙ্গীতে বোঝাচ্ছে সবে মাত্র তিনি উড়ে এসে পা রেখেছেন কোনও নৌকার পাটাতনের ওপর।

পৃথিবীর সুন্দরী-শ্রেষ্ঠা ভেনাস, তিলোত্তমা আবিষ্কার হলেন গ্রীসেরই মেলোস দ্বীপে। ফরাসী সরকার কিনলেন ভেনাসকে মাত্র ছ হাজার ফ্রাঁক দিয়ে। টাকায় দাঁড়ায় দশ হাজার মুদ্রা। অবিশ্বাস্য নয়? গ্রীক আর রোমান আরট-এর, হেলেনিজম থেকে রোম সাম্রাজ্যের পতন পর্যন্ত ধারাবাহিক বিবর্তনে কোনও ফাঁক নেই লুভ্র সংগ্রহে—মার্বেল, ব্রোঞ্জ, সিরামিক্স, সোনা, রূপা, আইভরী, কাচ, ফ্রেসকো—কী নেই?

মিশরীয় অ্যান্টিকুইটির আলাদা সম্মান। যিশু জন্মাবার আড়াই হাজার বছর আগের অনুলেখক মশাই কলম বাগিয়ে বসেছেন, ডিকটেশন নিচ্ছেন। লাইমস্টোনের ওপর রঙ করা এই মূর্তিটি দেখে মনে হয় যেন কোনও ভটচাযি্য মশাই—ভাটপাড়ায় যাঁর বাড়ি। চোখে মুখে বুদ্ধি। মিশরের ভাস্কর্য বলতে, পুস্তক মাধ্যমে আমাদের যে ধারণা, তার সঙ্গে এ মূর্তির নেই কোনও মিল; রিপ্রেজেনটেশনের

চূড়ান্ত।

এবার ষোল শতকে আসা যাক। মিকেলাঞ্জেলো। শিল্পগুরুর নাম শুনতে কেউ কী বাদ আছি আমরা? এঁরই হাতে হয়েছিল ভাস্কর্যে গ্রেকো-রোমান আরটের পুনরুজ্জীবন। নিখুঁত অ্যানাটমি আর নিখুঁত ভাবপ্রকাশ। অনবদ্য মূর্তি দুটি, ডাইং স্লেভ আর রেবল স্লেভ সৃষ্টি হয়েছিল শিল্পীর কলাকৌশলে পোপ জুলিয়াস দ্বিতীয়র সমাধি সৌধে রাখা হবে বলে। কিন্তু বাতিল হয়ে যায়। মিকেলাঞ্জেলো ও দুটি উপহার দিলেন তাঁর এক বন্ধুকে। বন্ধুর বন্ধু অঁরী দ্বিতীয়র হাতে এলে তিনি তাঁর এক উচ্চ পদস্থ কর্মচারীকে রাখতে দেন। সেখান থেকে আসে কারডিনাল দ রিশলিও কাছে। কারডিনাল প্রথমে রাখেন শাতো দ পোয়াতুতে, তারপর পারীতে তাঁর নিজ ভবনে। লুভরে আসার আগে ওরা ঠাঁই পেয়েছিল ফরাসী স্মৃতিস্তম্ভ-সংরক্ষণাগারে। একদা মূল্যহীন ভাস্কর্য দুটি লুভ্রে আসার পর অমূল্য বলে স্বীকৃত।

লিওনার্দো দা ভিঞ্চির মোনালিসা দারুণ ছবি। সব সমালোচনার ঊর্ধ্বে। কিন্তু লুভ্রের ছবি বলতে শুধুই কী মোনালিসা? ঐ ঘরেই আরও ছবি আছে লিওনার্দোরই আঁকা। বলে রাখি, যে ছবি লুভ্রে দেখা যায় সেই একই ছবি লনডনে কিংবা অন্য কোনও মিউজিয়ামে দেখা যেতেও পারে। তা কিন্তু কপি নয়, মূল শিল্পী স্বয়ং অনুরূপ বিষয়ে একাধিক ছবি আঁকতেন সেকালে। তবে মোনালিসা সারা পৃথিবীতে ঐ একটিই। মোনালিসা প্রতিকৃতিটি, এখন বিশেষজ্ঞরা নিঃসন্দেহ যে মোনালিসা গেবারদিনি নাম্নী মহিলারই। ফ্লোরেন্স-এর জনৈক ফ্রানসেসকো ডেল জিয়কণ্ডোর পত্নী। ছবিটি সম্ভবত জিওকণ্ডো গ্রহণ করেন নি। অনেক গল্প আছে, কিছু সত্যি কিছু কাল্পনিক। তবে ছবিটি, যে কোন কারণেই হোক, শিল্পী লিওনার্দোর কাছেই থেকে যায়। শিল্পী সব সময় ছবিটি নিজের কাছেই রাখতেন, তাঁর সর্বাপেক্ষা প্রিয় ছবি। ১৫১৬

সালে রাজা ফ্রাঁসোয়া (প্রথম) যখন লিওনার্দোকে ফ্লোরেন্স থেকে পারীতে আমন্ত্রণ করে নিয়ে আসেন, মোনালিসা লিওনার্দোর সঙ্গেই ছিল। ফ্রাঁসের অঁাব্রোয়াজ-এ শিল্পীর থাকার ব্যবস্থা হয়, তিন বছর পর ঐ খানেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিন বছরে বেশ কিছু নতুন কাজ তিনি রেখে গেছেন। লিওনার্দোর মৃত্যুর পর মোনালিসাকে নিয়ে এসে রাজা ফ্রাঁসোয়া তাঁর 'ছবি ঘরে' টাঙিয়ে রাখেন; সেই থেকেই মোনালিসা লুভ্রে। না, শোনা যায় বার দুয়েক মোনালিসা লুভ্রের বাইরে বেরিয়ে পড়েছিল, মোনালিসা দুবার চুরি হয়েছিল। দ্বিতীয়বার মোনালিসাকে উদ্ধার করা হয় এক রেস্তোরাঁ থেকে। মোনালিসার ওপর টেবল ক্লথ ঢাকা দিয়ে দিব্যি খাওয়া দাওয়া চলছিল, কিন্তু ফরাসী গোয়েন্দা পুলিস খোঁজ পেয়ে যায়। ঠোঁটের কোণে হাসি, মোলায়েম মুখাবয়ব আর পিছনের আবছায়া স্বপ্নসম পটভূমি নিয়ে মোনালিসা লুভরে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত। চুরি হবার আর সম্ভাবনা নেই, খুব অঁাটসাঁট সাবধানতা। কর্তৃপক্ষ দাবি করেন রণেসাঁস চারুকলার প্রতিনিধিত্ব লুভরে যেমন পূর্ণাঙ্গ, পৃথিবীতে আর কোনও মিউজিয়াম বা গ্যালারীতে তা দেখা যাবে না। রণেসাঁস কালে ফ্লোরেন্স আর ভেনিস দুই শহরেরই, শিল্পীরা পাল্লা দিয়ে চালিয়েছিলেন ছবি এবং ভাস্কর্যে প্রকৃতির পুনঃপ্রতিষ্ঠা আন্দোলন। মানুষকে মানুষের মত করেই দেখাতে হবে। রূপের কোনও বিকৃতিকরণ, অতিরঞ্জন, অনুরঞ্জন—কিচ্ছু চলবে না। মার্জিত রেখায় রূপের বিশুদ্ধ গঠনের দিকে দৃষ্টি দিলেন ফ্লোরেন্সের মাস্টাররা —লিওনার্দো, রাফেল, মিকলাঞ্জেলো এবং করেজিও। ভেনিসে তখন বর্ষীয়ান শিল্পী জিওরজিওন এঁকে চলেছেন ল্যাণ্ডস্কেপ, বিবসনা আর সেকালের জীবনভঙ্গী। পোশাক অঁাকায় সে কী পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা, ঘাগরা বা চাদরে কিংবা ঝালরে কোথায় কী ভাঁজ তা অতি সূক্ষ্মভাবে তুলে ধরা হচ্ছে, আর তাল তাল আলোয় সারা ছবি জ্বল জ্বল করছে। জিওরজিওন-শিষ্য তিজিয়ানো গুরুর

পদানুসরণ করে চলেছেন নির্ভুলভাবে। একটি ছবি আছে, নাম রাসটিক কনসার্ট। এটি জিওরজিওনের আঁকা, না তিজিয়ানোর আঁকা? বেশ কিছুকাল লুভরের ক্যাটালগে এ ছবি জিওরজিওনের পরিচিত হয়েছিল, এখনকার বিশেষজ্ঞরা সব লক্ষণ বিচার করে, সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে ছবিটি তিজিয়ানো অঙ্কিত। বুঝুন তবে কতটা মিল গুরু এবং শিষ্যের ক্রিয়াকৌশল আর প্রকাশ-ভঙ্গীতে। ভেরোনীজ আর তিনতোরেত্তো। রণেশাঁস শিল্পী বলে প্রচার করা হলেও রণেশাঁস আদর্শ থেকে কিছুটা এঁরা নিশ্চিত সরে গিয়েছিলেন। কিছুটা অতিরঞ্জন, কিছুটা অলঙ্করণের দিকে ঝোঁক চলে গিয়েছিল। বারোক নাটকীয়তার সূত্র অবশ্যই মিকলাঞ্জেলোর ফ্রেসকো, এই দুই শেষ রনেসাঁস শিল্পীরও রচনাকৌশল পরবর্তী চিত্রধারায় কিছু কম প্রভাব রাখেনি। রনেশাঁসের লক্ষণ প্রথম ধরা পড়ে জিয়োত্তোর কলাকৌশলে। জিয়োত্তোর গুরু সিমাব্যু, শিষ্যের বেচাল অবস্থা দেখে তাঁকে বিতাড়িত করেছিলেন, কিন্তু পরে শিষ্যেরই হল জয়জয়কার। সিমাব্যু থেকে আরম্ভ করে তিন-তোরেত্তো—মিউজিয়ামের একটি বিরাট অধ্যায়।

ফরাসীদের নিজের আরট মিউজিয়াম লুভর, সুতরাং ফরাসী শিল্পীদের একটু বেশি হাঁকডাক তো এখানে থাকবেই। অ্যাঁগ্র কুরবে, জেরিকো, দলাক্রোয়া—এঁদের কাজ পৃথিবীর যে কোনও মিউজিয়াম পেলে ধন্য হয়, তা হলেও বলতে হয় লুভরে ফরাসীদের খাতির একটু বেশি, প্রায় রনেসাঁস মাস্টারদের সমান সমান। বিদেশী শিল্পীদের মধ্যে রেমব্র্যানট, ডুরের, গোয়াইয়া, হলবীন, ভেলাজকোয়েজ, হালস, ভ্যারমিয়ের, গ্রেকো, নিঃসন্দেহে মহামূল্য সংগ্রহ। ফ্লেমিশ বা ডাচ বা জর্মন আরট সংখ্যায় এখানে খুব বেশি না থাকলেও মন্দ কি? বাঘা বাঘা শিল্পীদের শিল্পক্ষমতার চরম নিদর্শন বলতে কারোর আপত্তি হবে না।

লুভর মিউজিয়াম একদিনে দেখার নয়। ঠিকভাবে দেখতে

গেলে দিনের পর দিন, মাসের পর মাসও লেগে যেতে পারে। বর্তমানে লুভর মিউজিয়ামে আরট বস্তু আছে চার লক্ষের ওপর।

আর্ক দ্য ত্রিয়ঁফ থেকে শাঁজেলিজে ধরে পয়দল চলেছেন লুভরের দিকে। পারী নগরী মোটর গাড়ি করে ঘুরে বেড়িয়ে দেখা যায় না, যত অর্থই ব্যয় করুন না কেন, না হাঁটলে পারীর পরিচয় মিলবে না। মধ্যে পড়বে প্লাস দ লা কঁকর্দ। এই আটকোণা কঁকর্দ-এর নাম ছিল আগে লুই পঞ্চদশ স্কোয়ার। কোণে কোণে স্টাচু, শিল্পীদের অসাধারণ মুনশীয়ানার সাক্ষ্য দিচ্ছে, স্তম্ভিত হয়ে থেমে থেমে দাঁড়াতে হবে তাদের আকর্ষণে। রাজবাড়ির বিবাহ উৎসবে কত বাজি পুড়েছে, কত হইচই আনন্দে মুখর হয়ে উঠেছে এই স্কোয়ারটি এক সময়ে। তারপর একদিন এই লুই পঞ্চদশ স্কোয়ারই হয়ে গেল বিপ্লব স্কোয়ার। রাজার স্টাচুটি নামিয়ে গুঁড়িয়ে ফেলা হল। ঐখানেই ঝোলান হল গিলোটিনের প্রকাণ্ড ব্লেড। লুই ষোড়শের বলিদান হবে। লুইকে নিয়ে আসা হল রু রোয়াইয়াল ধরে, ধীরে ধীরে উঠে গেলেন তিনি সিঁড়ি বেয়ে, শান্ত এবং নিস্তব্ধ। গুটি কয়েক ড্রাম বেজে উঠল এক সঙ্গে, জনতার আকাশভেদী চিৎকার, রাজা উচ্চ কণ্ঠে জানাতে চেষ্টা করলে, 'আমার দেশবাসী, আমাকে মেরে ফেলা হচ্ছে। যে দোষে আমি অভিযুক্ত, আমি সে দোষ করিনি! ঈশ্বরের কাছে কামনা আমার রক্ত ফ্রাঁসের সুখ দৃঢ়তর করুক।' ও কথা ক'জনের কানে গেল? পরে ১৩৪৩ জন অভিজাত সন্তানের বলিদান-পর্ব চলল এক এক করে। এদের মধ্যে ছিলেন মারী আঁতোয়ানেৎ, মাদাম দ্যু বারী, শারলৎ করদে, জিরোনদাঁরা, দাতোঁ এবং তাঁর বন্ধুবান্ধব, মাদাম রোলাঁ, রোবস্পিয়ের এবং সমর্থকবৃন্দ। দু বছর পর, অর্থাৎ ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ঐ বিরাট খাঁড়ার শব্দ আর শোনা যায়নি। যে কজনকে হত্যা করা হয়েছিল, ফরাসী ইতিহাসে তাদের নাম কোনও না কোনও ভাবে উল্লেখিত।

রক্তসিক্ত বিপ্লব স্কোয়ারের নাম বদলে বলা হল প্লাস দ লা

কঁকর্দ—ইংরাজীতে যে শব্দ কন্‌কর্ড। কিন্তু নাম বদলালেই কী ইতিহাস মুছে যায়?

ক্রমশই লুভর কাছে আসছে, আশেপাশের নানা মূর্তি—গ্রীক ভাস্কর্যের নকল দেখতে দেখতে এগিয়ে যাচ্ছেন। তুইয়েরীর বাগান। রদাঁকৃত মূর্তির একাধিক রেপ্লিকা, তারপর মাইওয়োলের রমণীরা। লুভরের ভিতরে আছে বিগতকালের মাস্টারদের কলাকৌশল। ভিতরে প্রবেশ করার আগে সমকালীন আরট দেখে মনকে কিছুটা তৈরী করে নিতে হবে। অবশ্য রদঁা বা মাইয়োল এঁরা সমকালীন বিমূর্ত কলার উপাসক কেউই নন। রদাঁর কাজে শিল্পীর ব্যক্তিত্ব স্পষ্টোচ্চারিত হলেও তা ষোল আনাই ট্রাডিশন-ভিত্তিক। অনেক শিল্পী এবং সমালোচকের মতে মাইয়োল সমকালীন ভাস্কর্যে এক পথপ্রদর্শক। রদঁার বলিষ্ঠতায় হিপনোটাইজড না হয়ে তিনি ভিন্ন পথের পথিক হয়েছিলেন। সেইটেই শিল্পীর সবচেয়ে বড় বাহাদুরি। স্ত্রীরূপ মাধ্যমে অমন সহজভাবে মাস, ভল্যুম আর মুভমেন্ট-এর উপস্থাপনা বাস্তবিকই কৃতিত্বের বিষয়। মাইয়োলের স্ত্রীলোকেরা একটু স্থূলকায়া। স্ত্রী মূর্তি বটে কিন্তু তারা প্রতিনিধিত্ব করছে নদী, কিংবা পবন, কিংবা কোনও ঋতুর। যাঁরা ইমপ্রেশনিস্ট রনোয়ার ভাস্কর্য দেখেছেন, তাঁরা বলেন, ভীষণ মিল মাইয়োলের কাজের সঙ্গে।

রেস্তোরঁায় বসে লাঞ্চ মানেই মস্ত খরচ। দরকার কী? পথের ধারের দোকান থেকে মাছ ভাজা, ফাউল রোস্ট, রুটি, আলু ভাজা আর জলের বদলে সোডা ওয়াটার, কিংবা বিয়ার নিয়ে এসে দিব্যি মধ্যাহ্ন ভোজন হয়ে যাবে! সেরে নিয়ে আবার ঢুকুন লুভরে।

ঝো দ পম কোনও খেলার ঘর নয়, একটি আরট মিউজিয়াম। ফরাসী ইমপ্রেশনিস্ট চিত্রকলা লুভরের প্রাচীন কলাকৌশলের সঙ্গে মেজাজে খাপ খায় না, লুভর কর্তৃপক্ষ মনস্থ করলেন ইমপ্রেশনিস্টদের লুভর থেকে সরিয়ে অন্য কোথাও স্থানান্তরিত করতে হবে। রাজ-প্রাসাদের পাশেই রাজা-রাজড়াদের খেলার বাড়ি তখন খালি পড়ে

আছে, যো দ পম পরিণত হল আরট মিউজিয়ামে, সব ইমপ্রেশনিস্ট আরটিস্টদের চিত্রকলা জমা হল সেখানে। ইমপ্রেশনিস্ট স্কুলের জন্ম হয় আজ থেকে প্রায় একশ কুড়ি বছর আগে। ক্লোদ মনে আর সিসলী তখন শুরু করছেন 'লাইট এফেকট' নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা। তাঁদের গুরু ছিলেন বুদ্যাঁ এবং যোংকিণ্ড। এ পরীক্ষা-নিরীক্ষায় যোগ দিলেন পিসারো, এডুয়ার মানে, সেজান এবং বাজিল। একটি গ্রুপ গড়ে উঠল। গ্রুপে এসে যোগ দিলেন বার্থ মরিজো আর ফাতঁ্যা লাতুর। দ্যাগা—অ্যাগ্রর শিষ্য, নিজেকে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে চলছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনিও ইমপ্রেশনিস্টদের দলে ভিড়লেন। এঁদের নিয়মিত প্রদর্শনী হতে থাকল আর সংবাদপত্রে কটাক্ষ করে করে সমালোচনাও প্রকাশ হতে লাগল। কিন্তু এঁরা দমবার পাত্র নন! ইমপ্রেশনিস্ট প্রভাব পড়ল পরবর্তী অনেকের ওপর। সোরা, তুলুজ লোত্রেক, রুসো, সিনা, গগ্যাঁ এবং সেই ক্ষ্যাপা শিল্পী ফান গঘের ওপরেও। এঁদের সবার ছবির আবাস যো দ পম। যো দ পম-এ ঢুকেই নজর পড়ে তুলুজ লোত্রেকের লাগুলুর ওপর। দ্যাগা, মানে, সিসলী দেখে দোতলায় গেলে অভ্যর্থনা জানান মনে তাঁর রুয়া কাতেদ্রাল মাধ্যমে। দোতলাতেই রনোয়র আছেন, সেজান আছেন, গঘ আছেন, গগ্যাঁ আছেন। ইমপ্রেশনিস্টদের কাজ পারীতে যো দ পম ছাড়া অন্য স্থানেও দেখা যায়।

ভারতীয় আরটের আলাদা মিউজিয়াম মুজে গিমে, আর সমকালীন আরট-এর—যার মধ্যে ব্রাক, পিকাসো, মাতীস, মন্দ্রিয়ান, কানডিনস্কী, ক্লী-রা রয়েছেন, তার জন্যে গ্যালারী ববুর। আরও অনেক আরট মিউজিয়াম আছে—যেমন মুজে রদাঁ, মুজে বোজার ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু লুভর রাজপ্রাসাদ চিরকালের রাজপ্রাসাদই বটে। মরণজয়ী রাজা শিল্পীদের আবাস। সমকালীন কে বসার স্পর্ধা রাখে মিকেলাঞ্জেলো, লিওনার্দো, তিজিয়ানো আর গ্রীক মাস্টারদের পাশে?

প্যারিসের দ গল্ এয়ার পোর্ট। অদিতি আর ওর কর্তা ফ্রেদারিক গাল্ঁ্যা গেট পেরিয়ে আর এদিকে এগোলো না ; নিজের কাঁধ থেকে ঝোলাটা নামিয়ে হাতে ধরিয়ে দিয়ে অদিতি বলল, "এই নিন, গেটের ওপারে আমাদের যাওয়া নিষিদ্ধ, এবার আপনার নিজের ঝোলার দায়িত্ব নিজে নিন।" বিদায় জানিয়ে কর্তা-গিন্নী ফিরে গেল। গড়ানে এসকেলেটর ধরে ওপর দিকে চললাম। এক কাউণ্টার। থামতে হল। আরও অনেকে কিউ-এ আছেন। কিছু দস্তখত করতে হবে, মস্কোগামী, যাত্রীদের ওটা অবশ্য করণীয়, রুশী কর্তৃপক্ষ ধার্য কানুন। দস্তখত পর্ব শেষ হতে ঝোলা কাঁধে আবার চলন। সামনে বিশালদেহী দুই পুলিশ হেলে দুলে ঘোরা ফেরা রত। জিগেস করলাম "চার নম্বর গেটটা কোন দিকে পড়বে?" আঙ্গুল নেড়ে ফরাসী পুলিশ জবাব দিল "নো ইংলিশ।" বুঝুন।

চার নম্বর গেট দিয়ে নির্দিষ্ট স্যাটিলাইটে আমাকে পৌঁছতে হবে। মহাকাশে ওড়ার উপগ্রহ অবশ্যই নয় এ স্যাটিলাইট, হাওয়াই জাহাজে উঠে বসবার আগে যে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়, এ সেই অপেক্ষাগার। দেখতে গোলাকার ফুটবলের মত। আরও উত্তম উদাহরণ হবে, সাবানের বুদবুদের মত। সারা মাথাটা স্ফটিক কাচের। শেষ পর্যন্ত এধার ওধার করে খুঁজে পেতে চার নম্বর গেট ধরে ঢুকলাম স্যাটিলাইটের মধ্যে। এক ইউনিফরম পরিহিতা মহিলা আসন দেখিয়ে বসতে বললেন। তাঁর মুখে ইংরাজী শব্দ। সময় হলে ডাক পড়বে, এখনও দেরী আছে অনেক। আমিই প্রথম। আমার পর এলেন এক জাপানী ভদ্রলোক, তারপর জনা তিনেক সিঙ্গাপুরী ছোকরা, তারপর এক জাপানী পরিবার, তারপর ফরাসী, ইংরাজ—এমনি ভাবে ধীরে ধীরে অপেক্ষাগারটি চেহারা ধারণ করল সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের।

মাইকে ঘোষণা—"যাত্রীগণ প্রস্তুত হউন।" হাই হীল জুতোর খট খট শব্দ করে এক গোলগাল ছোটখাট্ট মহিলা সামনে এসে ঠোঁটে হাসি টেনে বললেন, "এবার যেতে হবে।" ঢুকলাম সুড়ঙ্গ পথে। সুড়ঙ্গ পথ ধরে সচরাচর একেবারে প্লেনের মধ্যেই প্রবেশ করার ব্যবস্থা, এখানে কিন্তু তা হল না, সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে আমাদের চড়তে হল এক কোচ-এ। এয়ার পোর্টের সিমেন্ট বাঁধাই চত্ত্বরের ওপর দিয়ে এঁকে বেঁকে পৌঁছলাম বেশ দূরে দণ্ডায়মান এরোফ্লোটের ইলুসীন উড়োজাহাজের গা ঘেঁষে। কিন্তু বিধাতা বাধ সেধেছেন, জাহাজ বিগড়ে গেছে, মেরামত করতে সময় লাগবে। আগে মেরামত হোক, তারপর প্যাসেঞ্জারদের আসন গ্রহণ করতে দেওয়া হবে, তার আগে নয়। কোচ থেকে নেমে পড়েছিলাম; সেই মহিলার আজ্ঞা মত ফিরে উঠে বসলাম, আবার সেই স্যাটিলাইটে। কখন প্লেন ঠিক হবে, কখন আমরা আকাশে উড়ব সবই অজানা ভবিষ্যৎ। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যাচ্ছে, বসে বসে হাই

তুলছি। সামনের সোফায় দুটি জাপানী রমণী দিব্যি নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছেন। বেলা তখন প্রায় তিনটে, খুব ক্ষিদে পেয়েছে, ক্ষিদে পাবারই কথা, সকালে বেরিয়েছি যৎসামান্য প্রাতরাশ সেরে। আশা ছিল এরোপ্লেনে উঠে বসব ১২ ঘটিকার মধ্যেই, সামনে আসবে রুশ লাঞ্চ, কত তৃপ্তি করেই না গ্রহণ করব তার স্বাদ! কিন্তু কোথায় প্লেন? বসে আছি এই নকল উপগ্রহে যার নড়াচড়ার কোনও উপায় নেই, একেবারে জমির সঙ্গে মোক্ষম ভাবে আঁটা। কিছু কিনে যে খাব তারও উপায় নেই, স্যাটিলাইটের মধ্যে খাবার-ওয়ালাদের প্রবেশ নিষেধ। আরও এক ঘণ্টা পর এক ঠেলাগাড়ি করে কেক স্যাণ্ডউইচ আর কোকাকোলা এল, পাঠিয়েছেন কর্তৃপক্ষ। সাময়িক ভাবে বুভুক্ষুরা ঝিমুনি ছাড়িয়ে চনমনে হয়ে উঠেছে, কিন্তু একটা স্যাণ্ডউইচ আর এক বোতল মিষ্টি জলে কি আর ক্ষুধা মেটে? আবার সব চুপচাপ! পুরু কাচের চশমা পরা এক জাপানী ছোকরা আমার দিকে তাকিয়ে একটু হাসল, আমিও হাসলাম। "আপনি কোথায় যাবেন?" "কলকাতা!" "কলকাতার প্লেন ক'টায় মস্কো থেকে?" "শুনেছি ন-টা নাগাদ!" "আপনি কি আশা রাখছেন ও প্লেন ধরতে পারবেন?" পাশ থেকে এক সিঙ্গাপুরী দেঁতো হাসি হেসে বলে উঠল "ইমপসিবল!"

সন্ধ্যা তখন পাঁচটা। সেই ছোট খাট মহিলাটি ঘোষণা করলেন, "উঠে পড়ুন সবাই, এবার নিশ্চিত যাওয়া। প্লেন সারাই হয়ে গেছে।" আবার সেই কোচ-এ, আবার উড়োজাহাজের গা ঘেঁসে দাঁড়াল গাড়ি। আর রিহার্সাল নয়, নির্দিষ্ট সময়ের প্রায় পাঁচ ঘণ্টা পর আমরা সত্যি সত্যিই ফরাসী ভূমির সংস্পর্শ ত্যাগ করেছি। প্লেনের মধ্যে এয়ার হসটেস আর স্টুয়ার্ডের আদর আপ্যায়নের অন্ত নেই। "এক গ্লাস জল চাই, সাদা জল।" খুব তৃষ্ণা পেয়েছিল। প্রায় ওষুধ খাবার গ্লাসের সাইজের এক গ্লাস জল এক ট্রের মধ্যে রেখে স্টুয়ার্ড উপস্থিত করল সামনে। সর্বনাশ! করেছি কি! আমার

দৃষ্টি পড়েছে স্টুয়ার্ডের ফোর-আরমের ওপর। কি সাংঘাতিক পেশী, আমার হাতের অন্তত গোটা চারেক জোড়া দিলে পরে ওর একটার সমান হবে। এই লোকটিকে হুকুম করেছি! ঈশ্বরের ইচ্ছেয় অঘটন কিছু ঘটল না।

যখন মস্কো পৌঁছলাম, মস্কো সময় তখন রাত এগারটা। কলকাতার উড়োজাহাজ কখন ছেড়ে চলে গেছে! মস্কো এয়ার পোর্টের কিছুটা পরিচয় পেয়েছিলাম জার্মানি যাবার পথে আগেই, দেশে ফেরার সময় বৈশিষ্ট্যগুলো ভাল ভাবে গোচরে এল। জার্মানীর ফ্রাংকফুর্ট কিংবা অসট্রেলিয়ার সিডনী কিংবা ফ্রাঁসের ওরলি অথবা শার্ল দ গল এয়ার পোর্টের মত, কিংবা ভারতের সান্টা ক্রুজের মতও লোকে লোকারণ্য হয়ে জমজমাট হয়ে থাকে না মস্কো এয়ার পোর্ট। তা হবে কি করে? ওখানে তো নানান দেশের নানান এয়ার ওয়েজের হাওয়াই জাহাজ ওঠানামা করে না, একমাত্র রুশী এয়ার ওয়েজ এরো-ফ্লোটের একাধিপত্য। এই সিঙ্গাপুর এয়ার লাইনসের, ঐ ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের, ঐ এয়ার ফ্রাঁসের, ঐ জাপান এয়ার লাইনসের, ঐ কনটাস-এর, এই এয়ার ইণ্ডিয়ার এরোপ্লেন, যেমন ইন্টার ন্যাশনাল এয়ারপোর্ট গুলোতে দেখা যায়, মস্কোয় সেটি হবে না। লাল দিয়ে লেখা বোধহয় আফ্রিকার কোনও দেশের একটা এরোপ্লেন দেখেছিলাম মনে পড়ছে, তবে সেটা যাত্রীবাহী কিনা বলা যাবে না। মস্কো এয়ারপোর্ট বড় হবে কেমন করে? এরোফ্লোটের প্লেন বিভিন্ন দেশে যায়, আবার ফিরে আসে মস্কোয়। যখন কোনও প্লেন ওঠে বা নামে সেই সময়টুকু যা কিছু কর্মব্যস্ততা, লোকজনের ভীড়। অন্য সময় মনে হবে যেন ছুটির দিন, অফিস ফাঁকা, চেয়ার খালি। শুধু গুটি কয়েক ব্যক্তি জঙ্গী পোশাকে, গোমড়া মুখ করে, কোমর থেকে ঝুলন্ত রিভলভারে হাত রেখে ঘুরে বেড়ায় এদিক ওদিক। চতুর্দিকে স্বচ্ছ কাঁচের পার্টিশন। দেখতে বাহার বটে, কিন্তু স্বচ্ছ পার্টিশনের উদ্দেশ্য এপার ওপার লক্ষ্য রাখা, আর কাউকে সন্দেহজনক চরিত্রের মনে হলে

পাকড়াও করে হাজতে ভরা!

এক দল কটা চুল, গৌর বর্ণ মানুষের পিছু পিছু আমিও চলেছি ঝোলা কাঁধে। বেশ কিছুটা এগিয়ে গেছি, এক জানালায় টাকা দেওয়া হয়েছে কিনা তার প্রমাণপত্র পরীক্ষা করা হচ্ছে। কিন্তু টাকা দেওয়ার প্রশ্ন তো আমার বেলায় ওঠে না! যে কিউ-এ দাঁড়িয়ে আছি তাতে এক জনকেও আগে দেখেছি বলে তো মনে হচ্ছে না, অর্থাৎ ওরা আমার সহযাত্রী, প্যারিস থেকে আগত কেউই নয়। নির্ঘাৎ ভুল হয়েছে! দৈত্য বিশেষ এক সেপাইকে ভয়ে ভয়ে জিগেস করলাম, "কলকাতার যাত্রী, কোন দিকে যেতে হবে?" রুশী পুলিশ 'নো ইংলিশ' বলে ফরাসী কায়দায় মুখ ঘুরিয়ে চলে গেল না, সঙ্গে নিয়ে আমাকে ঠিক ঘরটিতে পৌঁছে দিয়ে গেল। সে ঘরে সেই মাদমোয়াজেল, সেই ঝুটি বাঁধা যুবক, সেই সিঙ্গাপুরী মেয়েটি, সেই মোটা সোটা জাপানী ভদ্রলোক—আর কোনও সন্দেহ নেই, লাইনে দাঁড়িয়ে পড়লাম; স্যাটিলাইটে এদের সবাইকেই আগে দেখেছি। আমি কিউ-এ একেবারে শেষে, কারণ পৌঁছেছি সবার পরে। এক বাইশ কি তেইশ বছরের রুশী কন্যা, সত্যি বলতে কি, রুশী মেয়েরা একটু বেশী স্বাস্থ্যবতী হয় বলেই জানতাম, কিন্তু এ মেয়েটি গঠনে আন্তর্জাতিক রূপ-প্রতিযোগিতায় অবশ্যই স্থান পেতে পারে, কালো পোশাক, দুধে-হলুদে গায়ের রঙ, বুকে এরোফ্লোটের ব্যাজ আঁটা, পর পর সকলের টিকেট দেখছে আর একই ঢঙে বলে চলছে 'নেক্সট ফ্লাইট'। নেক্সট ফ্লাইট মানে কারোর এক সপ্তাহ পর কারোর বা দু-তিন দিন পর। কেউ যাবেন টোকিও, কেউ যাবেন সিঙ্গাপুর, কেউবা আসবেন কলকাতা। আমার পালা আসতে, সেই 'নেক্সট ফ্লাইট'। বললাম, "নেক্সট ফ্লাইট তো সাত দিন পর, দোষটা আমার নয়, আপনাদেরই প্লেন মস্কো পৌঁছেছে পাঁচ ঘন্টা দেরী করে, আজকের কলকাতার ফ্লাইট ধরাতে না পারলে, সাতদিন আটকা পড়া মানে আমার যে বহুত ক্ষতি।" "তা কি করা

যাবে? আচ্ছা দেখছি, কাল কি পরশু আপনাকে ইণ্ডিয়া পাঠাবার ব্যবস্থা করতে পারি কিনা।"

"কিন্তু এ দুদিন থাকব কোথায়?"

"সে ভাবনা আপনার নয়, আমাদের!" আমরা চারজন ছিলাম কলকাতার যাত্রী, আন্দাজ, পঞ্চাশোর্ধা এক মাদমোয়াজেল, ঝুঁটি বাঁধা এক যুবক, সে মার্কিন নয় ফরাসী—তবুও হিপি, এক বেঁটে খাটো, বছর বিশেক বয়স নেপালী শেরপা, আর এই অধম। ওরা তিনজন কলকাতা হয়ে যাবে কাঠমাণ্ডু। এক মাত্র অধমেরই যাত্রা শেষ হবে কলকাতা পৌঁছে। শেরপাকে জিগেস করলাম "কেয়া করেগা?" সে বলল, "হাম তো নাহি জানতা, হাম পাহাড় পর চড়নে জানতা, এরোপ্লেনকা কুছ নাহি জানতা।" "তব ঠিক হ্যায়, হামকো সাথ সাথ রহো।" মাদমোয়াজেল একটু আধটু ইংরেজী বলেন, বল্লেন, "ইউ আর আওয়ার লীডার, উই শ্যাল ফলো ইউ।" টিকিট দেখার পালা শেষ হয়েছে এবার হবে পাশপোর্ট পরীক্ষা। প্রায় ফুট খানেক লম্বা মুখের এক মিলিটারী অফিসার পাশপোর্ট পরীক্ষা করছেন। অত্যন্ত গম্ভীর! নাম, ধাম, কোত্থেকে আসছি, কেন সেখানে গিয়েছিলাম ইত্যাদি ফিরিস্তি শেষ হবার পর শুরু হল পাশপোর্টে আমার যে ফটো সাঁটা আছে তার সঙ্গে জ্যান্ত মানুষটির মুখাবয়ব মিলিয়ে দেখা। অফিসার একবার আমার মুখের দিকে তাকান আবার ফটোর দিকে তাকান। তাঁর কুঞ্চিত ভ্রূ কিছুতেই আর অবিকৃত রূপ নিচ্ছে না। প্রায় পাঁচ মিনিট উৎকণ্ঠার পর স্বস্তি ফিরে পেলাম। কিন্তু পাশপোর্টটি ফিরে পেলাম না, তার বদলে একটি টোকেন হাতে ধরিয়ে দেওয়া হল। টিকিট আগেই নেওয়া হয়েছে। এখন যদি 'পারসোনা নন গ্রাটা' অর্থাৎ অবাঞ্ছিত ব্যক্তি বলে গ্রেফতার করা হয়, কোনও প্রমাণ নেই আপন পরিচয় দেবার।

ভেড়ার পাল যেমন এক জায়গায় জমা করা হয় খেদিয়ে কোথাও নিয়ে যাবার আগে, আমাদের অবস্থা কতকটা সেই রকম। সবাইকে

একটা গাড়িতে তোলা হল। মিনিট তিন চারেকের মধ্যেই পৌঁছলাম এরোফ্লোটের হোটেলে। সেই টিকিট-দেখা মেয়েটি যাত্রীদের নামের লিস্ট হাতে নিয়ে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে, আমরা দল বেঁধে দাঁড়ালাম একটি কাউন্টারের সামনে। কাউন্টারে আরও তিনটি মেয়ে, মধ্যের মেয়েটি মনে হয় উচ্চপদস্থা, সবার বুকেই এরোফ্লোটের ব্যাজ। "হোটেলে বেশি ঘর খালি নেই, দুজন দুজন করে থাকতে হবে একেক ঘরে।" কথাটা শোনা মাত্রই প্রচণ্ড ভাবে উঠল আপত্তির আওয়াজ। মধ্য বয়সী এক জাপানী ভদ্রলোক অন্য কোনও পুরুষের সাথে এক ঘরে থাকতে কিছুতেই রাজী নন। "এয়ার পোর্টের মেঝেতে শুয়ে থাকবে অন্যেরা আর আপনারা একেক জনে একেকটা ঘর উপভোগ করবেন, এই কি চান ?" আমার নাম আসতে অফিসার ভদ্রমহিলা একটি গোটা ঘরই একার জন্য নির্দিষ্ট করে দিলেন, এ দয়া যে কেন জানি না! ঘরের নম্বর শুনেই দৌড় লিফটের দিকে। নৈশভোজের কোন ব্যবস্থা নেই সে রাত্রে। সন্ধ্যা ছ'টা নাগাদ প্লেনেই পেট ভরে খেয়ে নেওয়া হয়েছে, সুতরাং নৈশভোজ না হলেও কিছু এসে যায় না।

রূপবতী রুশী মহিলাদের বাক্যি যেন শানিত তরবারি! কেউ কিছু প্রশ্ন করলে কট কট করে চোখের ওপর চোখ রেখে কাটা কাটা জবাব দেন। ওটা বোধহয় ওঁদের ট্রেনিং। কত রকম, কত দেশের মানুষের আসা যাওয়া, কার কি মতলব তা তো জানা যায় না, নরম প্রকৃতি বুঝলে তারা পেয়ে বসতেও পারে। শেরপা রুশী মহিলাদের রূপে নেশাগ্রস্থ, কিন্তু বাক্যিবাণে থেকে থেকেই তার নেশা যাচ্ছে ছুটে। আমার সাথে আছে মাত্র একটা নকল চামড়ার ঝোলা, বাক্স-প্যাটরা রয়েছে এয়ারপোর্টের গুদামে জমা। জার্মানীতে বড় বড় হোটেলে থেকে এসেছি, সুতরাং আমার পক্ষে রুশ হোটেল দেখে ঘাবড়ে যাবার কোনও আশঙ্কা নেই, ঝোলা কাঁধে বেপরোয়া লিফটে প্রবেশ করেই আট তলার বোতাম টিপলাম। ঘরের নম্বর

৮০৮। মনে হয় সামনের আটটা তলার নম্বর আর শেষের আটটা ঘরের নম্বর। ইউরোপীয় কায়দায় সজ্জিত বটে, তবে বাথরুমের বেসিনের কল পুরো বন্ধ হয় না, টস টস করে অনবরতই ফোঁটা ফোঁটা জল চুইছে এবং যেখানে জল পড়ছে সেখানে মরিচার মত লাল দাগ। কমোডেও ঐ রকম দাগ।

রাতটা কাটল। সকাল হতে আট তলার ঘরের জানালা দিয়ে নিচের রাস্তার দিকে তাকালাম। হোটেলের গেটের সামনেই বাস স্টপ। কোত্থেকে বাস আসছে, কোথায় যাচ্ছে কিছুই জানি না। জনা দুয়েক ব্যক্তি অপেক্ষমান, বাস আসবে তাঁরা তাতে উঠবেন। একটি একতলা বাস পৌঁছল, বাসটির অবস্থা দেখে বোঝা যায় ভাল নয়, পিছনে ধুলো জমা, চাকায় কাদা। প্যাসেঞ্জারদের তুলে নিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বাস গেল চলে। এ তো ভারতবর্ষেও দেখা যায়, এ দেখার জন্যে মস্কো আসার কি দরকার ছিল? সামনে রাস্তার ওপারে সার সার, বোধ হয় ফার্ গাছ, গাছ সম্বন্ধে আমার জ্ঞান সীমিত। তবে একথা ঠিক ও-জাতের গাছ ভারতবর্ষে কোথাও দেখিনি। ঘন সবুজ পাতার ফ্রক পরে যেন দলে দলে ব্যালে নর্তকী। শীত যখন আসবে, কোথাও আর একটুও সবুজ চোখে পড়বে না, বরফের সাদা থান জড়িয়ে ঐ দীর্ঘাঙ্গী বৃক্ষরাজী তখন থাকবে শোকে মুহ্যমান হয়ে। স্নান সেরে ঘরে চাবি দিয়ে বেরোলুম প্রাতরাশের সন্ধানে। কোথায় পাওয়া যাবে? মুখে বিরক্তির ভাব স্পষ্ট, এক সাহেব এগিয়ে আসছেন করিডোর দিয়ে, কথার উচ্চারণ শুনে মনে হয় ইংরাজ। প্রথমটা ভদ্রলোক বুঝতে পারেন নি, অন্যমনস্ক থাকায়, আমি কি জিজ্ঞেস করছি। পরে বললেন "ব্রেকফাস্ট খাবেন? চলে যান একেবারে একতলায়!" তারপর ঠোঁট উলটে, "কিন্তু কেবল শুকনো রুটি আর চা।" খাবার ঘরে পৌঁছে দেখি পুরোদমে ব্রেক-ফাস্ট পর্ব জমে উঠেছে। সেই বয়স্কা মাদমোয়াজেল, ঝুঁটি বাঁধা ফরাসী হিপি, নেপালী শেরপা, সিঙ্গাপুরী

এক চীনা যুবক আর এক যুবতী একটি বড়সড় টেবল দখল করে বসে গেছে। আমাকে দেখে সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে পাশের খালি কুর্সিতে বসতে অনুরোধ করল তারা। শেরপার সঙ্গে কথোপকথন শুরু করলাম। ফরাসী মহিলার জিজ্ঞাসা, "ওটা কি ভাষা? শের-পার চটপট জবাব, "হিন্দী; আই স্পিক ইংলিশ, ফ্রেঞ্চ, হিন্দী, বেঙ্গলী, নেপালী—অল ল্যাঙ্গুয়েজ।" দু চারটে করে শব্দ শিখে ব্যাটা সব ভাষায় পণ্ডিত বনে বসে আছে! শুধু শুকনো রুটি আর চা নয়, সঙ্গে কয়েক টুকরো ঠাণ্ডা মাংস আর শশার চাকাও ছিল। ব্রেকফাস্ট তো হল, এবার খোঁজ নেওয়া দরকার দেশে ফেরার কোনও ব্যবস্থা হচ্ছে কিনা। রিসেপশনিস্টের সেই নিরস উত্তর, "কিছু বলা যাবে না, ব্যবস্থা হলেই জানতে পারবেন।" লাউঞ্জে এসে কৌচে বসলাম। লম্বা চওড়া দেখতে, গোঁফে তা দেওয়া, গৌরবর্ণ কিন্তু চুল, ভ্রু আর গুম্ফের রঙ মিসমিসে কালো, এক ভদ্রলোক হিন্দী মিশ্রিত উর্দুতে আমাকে উদ্দেশ করে কথা শুরু করলেন। বললাম, "আমি বাঙ্গালী, কলকাতার বাসিন্দা! আপনি?" "এক হি বাত হ্যায়, হাম ভি কলকাত্তা গয়া থা!" আরও কয়েকটি কথার পর পরিষ্কার হল ভদ্রলোক আসলে পাকিস্থানী। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি ছিলেন এক খান সৈন্য। বন্দী হয়েছিলেন। বন্দী অবস্থায় একবার কলকাতায় এসেছিলেন। অর্থাৎ প্রিজন ভ্যানের জানালা দিয়ে তাঁর কলকাতা দর্শন হয়েছে। বর্তমানে থাকেন পশ্চিম জার্মানীতে। বড় ছেলের বিয়ে হবে করাচীতে। করাচী যাবার পথে এই বিভ্রাট, পাঁচ দিন হল মস্কোয় আটকা পড়ে আছেন। অতি ভদ্র, অতি অমায়িক। আমি যেন তাঁরই দেশবাসী, খুবই ঘনিষ্ঠ! পাকিস্থানের সঙ্গেই না আমাদের মাঝে মাঝেই লড়াই বাঁধে? কিন্তু এ পাকিস্থানী তো আমাকে আত্মীয়ই বানিয়ে বসল!

লাউঞ্জের বাহিরে বেরোনর হুকুম নেই, দরজার সামনে বন্দুকধারী

প্রহরী। বস্তুত আমরা রাজবন্দী! "আপনারা যে যে মস্কো শহর দেখতে চান আমার সঙ্গে চলে আসুন।" একটি ২২/২৩ বছরের রুশী তুহিতা সামনে হাত ঘুরিয়ে বলে গেল! আর কেউ বসে থাকে! মেয়েটির পিছনে লাইন দিলাম আমরা প্রায় জনা ত্রিশ। পাকিস্থানী এলেন না, তাঁর আগেই দেখা হয়ে গেছে শহর মস্কো, তাঁর যে বন্দী দশা শুরু হয়েছে আমাদের বহু পূর্ব থেকেই। জাপানী, সিঙ্গাপুরী, কাফ্রী, ফরাসী, ভারতীয়, নেপালী, ইংরাজ কেউ বাদ নেই, সবাই উঠেছি বাস্‌গাড়িতে। রুশী মেয়েটি যাত্রীদের সামনে ফিরে মাইক ধরে বসল। ইংরাজীতে শুরু হল ভাষণ, "আমরা শীঘ্রই মস্কো শহরের কেন্দ্রস্থলে পৌঁছাব। প্রতিদিন মস্কো শহরে যত পর্যটকের সমাগম হয় পৃথিবীর অন্য কোনও শহরে..." ইত্যাদি। শকটটির অবস্থা কলকাতার স্টেটবাসের মতই প্রায়। লেনিনের মূর্তি, গোর্কীর মূর্তি, জনৈক রুশী কবির মূর্তি—মস্ত মস্ত ভাস্কর্য সব, কোনওটি বা চার মাথার মোড়ে, কোনওটি বা চওড়া রাস্তার পাশে, বড় ছোট বাড়ির পরিপ্রেক্ষিতে গাড়ির জানালার চার কোণ, ফ্রেমের মধ্যে দিয়ে দেখছি যেন টাউনস্কেপ পেইন্টিং। বার্ণট সিয়েনা আর গ্রের আধিক্য। সবুজ গাছপালা গোচরে আসছে কিন্তু পারিপার্শ্বিক আঁধারী আবহাওয়ায় হরিতাল তার নিজ গরিমায় পরিপূর্ণ হতে পারছে না। তার ওপর আবার কুয়াশা। আলোর অভাব হলেই উত্তাপ যাবে কমে, তা সে যতই বাহারী রঙ হোক না কেন। দু গাড়ি তিন গাড়ির ট্রাম চলে ঢিমে তালে, পাশে পাশে ডিজেল চালিত আর বিদ্যুৎ চালিত বাস্-ও চলছে, আর চলেছে ফুটপাথ হয়ে কাতারে কাতারে মানুষ। মানুষগুলোর পোশাকে নেই রঙের বাহার, বৈচিত্র্যও নেই, যেন ইউনিফরম পরা মিলিটারী সব। পার্থক্য নিশ্চয় আছে, কিন্তু এক ভারতীয়র চোখে ওদের সবার পোশাকই এক। হাঁটার ছন্দও এক। ওয়াসিলি কানডিনস্‌কীর জন্ম হয়েছিল মস্কো শহরে। বর্ণই হল কানডিনস্‌কীর ছবির সবটা। জন্মভূমি

ছেড়ে তিনি বাসা বেঁধেছিলেন মিউনিখে। মস্কো তাঁকে ধরে রাখতে পারল না কেন? কারণটা কী এই বর্ণাভাবই? মিউনিখে তিনি ছবি এঁকেছেন শুধু তাল তাল রঙ লাগিয়ে, নীল, সবুজ, হলুদ, শাদা—যেন ক্ষেপে গিয়েছিলেন কানডিনস্‌কী! অবশ্য আরট পণ্ডিতেরা লিখেছেন বহুবর্ণ মস্কোই তাঁর মনের মধ্যে ভাবমূর্তি হয়ে চিরস্থায়ী বাসা বেঁধেছিল। হবেও বা! বিচিত্র নক্সার অনেক সৌধ দেখেছি কিন্তু প্রকৃতির বর্ণাঢ্য কোথায় মস্কোয়?

এটা আরট গ্যালারী, ওটা ন্যাশনাল লাইব্রেরী, ঐ যে ইউনিভারসিটি। ইউনিভারসিটির সুঁচাল চূড়াটি ধরে রেখেছে ব্যালান্স করে গোটা আকাশ। ছাত্রদের পড়াশোনার ব্যবস্থা আর থাকার ব্যবস্থাও ঐ একই সৌধে। সামনে দিয়ে প্রবহমান মস্কভা নদী। নদী ছাড়া কি আর সমৃদ্ধ শহর গড়ে ওঠা সম্ভব? বলশয় থিয়েটার দেখে মনে পড়ে গেল পারীর অপেরা হাউস। কোনওটিই কম যায় না। ইচ্ছে হল একবার ঢুকি বলশয়ের ভেতর! কিন্তু সে ইচ্ছে চরিতার্থ করার উপায় নেই! গাড়ি থেকে নামারই তো হুকুম নেই। মস্‌কোর ফোয়ারা খুব বাহারে! সারা শহরে ফোয়ারা আছে অজস্র। বেশ কিছুটা ঘুরপাক খাইয়ে আমাদের ঢোকান হল এক বিপনিতে, যদি কেউ কেনাকাটা করতে চায়! ডলার, মার্ক, ফ্রাঁক সব চলবে। হুড়োহুড়ি পড়ে গেল, যে যত পারল মালপত্র খরিদ করল—মদ, স্ন্যাক্স, পোস্টকার্ড, পুলোভার, ব্যাগ, কিউরিও পুঁথির মালা, আরও কত কি। বেপরোয়া সওদা করল জাপানীরা, ওদের টাকার থলি কিছুতেই খালি হয় না। গোণাগুন্তি মুদ্রা পকেটে নিয়ে আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুধু দেখে গেলাম। আধ ঘন্টা পর আবার সেই কয়েদী-গাড়িতে। আবার ঘুরপাক, এ রাস্তা সে রাস্তা হয়ে আমরা পৌঁছলাম অলিম্পিক স্টেডিয়ামের ধারে। আকাশ ছোঁওয়া স্কী জাম্পিং-এর মঞ্চ! যারা ওখান থেকে লাফ মেরেছে, বেঁচে আছে তারা? বাস থেকে নেমে

পনের মিনিট হাত-পা ছাড়ানর হুকুম মিলেছে। সামনে একটা ছোট্ট দোকান, আমাদের এখানকার পান বিড়ির দোকানের মতই প্রায়, বৃদ্ধ দোকানীর এক হাতে কফির কাপ আর অন্য হাতে এক গোছা ছবি ছাপা পোস্ট কার্ড বেচছেন, খুব চড়া দাম! সময় ফুরিয়ে যেতে যে যার সীট দখল করলাম গাড়িতে। কিন্তু ড্রাইভারের পিছনের সীটটাতে যে নাক খ্যাঁদা চোখ সরু জাপানী ছোকরা এতক্ষণ বসেছিল, সে গেল কোথায়? আমাদের গাইড মেয়েটির মুখ শুকিয়ে চুন! খোঁজ খোঁজ! শেরপা বলল, "আমি তাকে স্টেডিয়ামের দিকে যেতে দেখেছি!" শেরপাকে সঙ্গে নিয়ে গাইড গাড়ি থেকে নেমে গেল। মিনিট দশেক পর তারা এল শূন্য হাতে, জাপানীকে পাওয়া যায় নি। কি হবে? গাড়ির একেবারে পিছনের সীট থেকে সামনে এল জাপানী। "লুকিং ফর মি?" গা ঢাকা দিয়ে ছোকরা একটু মস্‌করা করেছিল। "আপনারা কেউ যদি হারিয়ে যান, তাকে খুঁজে বার করা হবেই। রুশ পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে কেউ লুকিয়ে বসে থাকতে পারবেন না, কিন্তু ব্যাপারটা হবে আমার পক্ষে মারাত্মক, আমার সরকার ভীষণ কড়া।" শেষের কথাগুলো বলার সময় গাইড যেন বড় বেশী নরম হয়ে পড়ল। বেচারা!

রেড স্কোয়ারে সেন্ট বাসিলস কাথিড্রাল। সেন্ট বাসিলস এর ছবি বহু কেতাবেই দেখেছি। রুশ দেশের আবহাওয়া সৃষ্টি করতে কার্টুনিস্টরা বাসিলস গীর্জার ছবি অহরহই আঁকেন। আমিও এঁকেছি। তা কিছুটা ফটোগ্রাফ দেখে আর কিছুটা কাল্পনিক ভাবে। বাসিলস-এর সামনে দাঁড়িয়ে ভাল করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলাম ব্যাপারটা কি। মন্দির, মসজিদ' প্যাগোডা, গীর্জা সব একাকার হয়েছে বাসিলসের স্থাপত্যকলায়। আর সেই সঙ্গে বহু-বর্ণ নক্সার বাহার দশ-বারোটা গম্বুজ; প্রত্যেকটার চেহারা আলাদা। রাজা ইভান দ টেরিবল-এর বাসনায় ঐ বিচিত্র রূপে গীর্জাটি ওঠে

দাঁড়িয়ে। জগৎ বিখ্যাত বাড়িগুলির অন্যতম সেন্ট বাসিলস। পারশিয়ান স্থাপত্যের প্রভাব যেমন উত্তর ভারতে এসেছে রাশিয়াতেও তা কিছু কম যায় নি। কিন্তু আমরা, ভারতীয়রা, আহামরি করব কি বলে? ইসলামিয় স্থাপত্য কিছু চোখে পড়লেই আমাদের যে তাজমহল কিংবা সিকান্দ্রার রূপ মনে পড়ে যায়!

"ঐ যে বড় বাড়িটি দেখছেন, ওটা একটি হোটেল। ইউরোপের মধ্যে সবচেয়ে বড় হোটেল। এ হোটেলে দু হাজারটি ঘর।" রেড স্কোয়ারের পাশেই ঐ হোটেল। রুশিরা সব কিছুই বৃহদাকারে উপস্থাপন করতে ভালবাসেন, ছোটখাটতে মন বসে না ওঁদের। বৃহত্বে সব ব্যাপারেই যেন রেকর্ড করার প্রয়াস। সেকালে যা হয়েছে, হয়েছে! এখন যা হচ্ছে বা হবে তা সবই রেকর্ড ভাঙবে।

আমরা কলকাতায় বসেও রুশী শিল্পীর বৃহৎ কর্ম দেখতে পাই। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের ডান দিকের ঘরের সারা দেয়াল জোড়া 'জয়পুর প্রসেশন' ছবিটি ভাসিলি ভেরেসচ্যাগিনের আঁকা। দাবী করা হয় ছবিটি বৃহত্বে পৃথিবীর দ্বিতীয় স্থানাধিকারী। ভেরেসচ্যাগিন ভারতে আসেন সিপাই বিদ্রোহ বাঁধার কিছু আগে। ব্রিটিশ সরকার তাঁকে ভারত ত্যাগ করতে বাধ্য করে কারণ তিনি যে সাক্ষী! বিদ্রোহের বেশ কিছু ঘটনা তার নোট বই-এ স্কেচ করে লিপিবদ্ধ করে নিয়েছিলেন শিল্পী। পুসকীন আরট গ্যালারী মস্কোর সর্ব-বৃহৎ সংরক্ষণাগার। শুধু রুশ শিল্পীদেরই আরট নয়, গোড়ার দিকের ইতালীয় মাস্টারদের, স্পেনের এল গ্রেকোর, হল্যাণ্ডের রেম-ব্রাণ্টের, ইংল্যাণ্ডের কন্সটেবলের, ফ্রাঁসের কোরোর এবং পরবর্তী যুগের পিকাসো আর ফান গঘের ছবিও সংরক্ষিত পুসকীনে।

১২টা বেজে প্রায় ৫/১০ মিনিট পেরিয়ে গেছে, মধ্যাহ্নভোজ বুঝি আর জুটল না কপালে। হোটেলে ফিরে এসে, মুখ হাত ধোবারও সময় নেই, হুড়পাড় করে ঢুকে পড়লাম খাবার ঘরে। একটিও আসন খালি নেই। সকালে আরও দু একটি প্লেন নেমেছে

এয়ারপোর্টে এবং যথারীতি যাত্রীরা আটকা পড়েছেন ঐ হোটেলে, সব নতুন মুখ! খুব সৌভাগ্য মিনিট খানেকের মধ্যেই আমার সামনের কুর্সিটি ফাঁকা হল। মুখোমুখি বসেছেন এক সবুজ টাই বাঁধা ভদ্রলোক, গায়ের রঙ জাম ফলের মত অতটা না হলেও, কাছাকাছি। দেখে বাঙ্গালী বলেই মনে হয়। অনিবার্য বাঙ্গালী! তবুও ইংরাজী-তেই প্রশ্ন করলাম, বাংলায় যার তর্জমা, "আপনার দেশ কোথায়?" এক শব্দের জবাব, "ডেনমার্ক!" দ্বিতীয় কথা জিগেস করার ইচ্ছে হল না। ভদ্রলোক পার্শ্বে উপবিষ্ট এক শ্বেতাঙ্গিনীর ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করতে লাগলেন। পরে জানতে পেরেছিলাম ভদ্রলোক বাঙ্গালীই; একেবারে বাঙ্গাল, পূর্ববাংলায়, অধুনা বাংলাদেশে জন্ম।

কতকটা মাদ্রাজী উথাপ্পার আকারের একটা মাংসের চাবড়া, লাল আটার মোটা জালির পাউরুটি, শশার কুচি, আহারান্তে ব্ল্যাক কফি—এই হল লাঞ্চ। মনে পড়ছে কয়েক টুকরো আলুভাজাও ছিল। সাদা জল আদৌ মিলবে না। পয়সা দিয়ে ওয়াইন কিংবা মিনেরাল ওয়াটার কিনে পান করতে হবে। পকেটে ডলার, পাউণ্ড, ফ্রাঁক, মার্ক থাকলে ভাবনা নেই, রুশ পয়সা দিয়েই যে দাম মেটাতে হবে তেমন কোনও বাধ্যবাধকতা নেই। জল পান যদি অত্যাবশ্যক হয়, ঘরের বাথরুমের ট্যাপ থেকে তা করা যেতে পারে। পাকিস্তানী ভদ্রলোক আহারান্তে নিয়মিত সেইভাবেই তৃষ্ণা নিবারণ করে থাকেন। কিন্তু বেসিনে আর কমোডে জল পড়ে যে দাগ হয়েছে তা দেখার পরও কি ও জল পান করার সাহস থাকে? দেশে ফিরে আসার দু সপ্তাহ পরেই কাগজ পড়েছিলাম ভারতীয় জাতীয় ফুটবল দল কোনও কারণে মস্কোয় আটকা পড়েন, তাঁদের সঙ্গে ভিসা ছিল না। অনুমান করতে পারি এরোফ্লোট পরিচালিত ঐ হোটেলেই ফুটবল দলটিকে অবস্থান করতে হয়েছিল। দলের কোচের বিবৃতি থেকে জানা যায় খুবই দুর্গতি হয়েছিল তাঁদের। স্নানাগারে জল ছিটিয়ে পড়ায় দল-নেতাকে হুকুম করা হয়ে ছিল তা পরিষ্কার করে দিয়ে আসতে।

অস্বীকার করব না, হোটেলের মহিলারা আমার সঙ্গে তেমন কোনও দুর্ব্যবহার করেন নি। ভিসা ছিল না, পাসপোর্টও কেড়ে রাখা হয়েছে, সুতরাং ভালো মানুষটি হয়ে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ মনে করেছি। হোটেলটি পরিচালনা করছেন, বলতে গেলে, মহিলারাই। সংখ্যায় তাঁরা অবশ্য প্যাসেঞ্জারদের তুলনায় অনেক কম, কিন্তু গেটের এপাশে যে বন্দুকধারী প্রহরা, তাকে দেখা যাচ্ছে না? সুন্দরী রমণী দেখলে দলবদ্ধ পুরুষের একটু দুষ্টুমি করার বাসনা অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু ও জায়গায়, ও অবস্থায় সামান্য ইসারা, ইঙ্গিতও বিপদ ডেকে আনতে পারে!.

হোটেলের আহার কোন প্যাসেঞ্জারেরই পছন্দ নয়। যাঁদের অর্থের জোর আছে তাঁরা দাবী করলেন তাঁদের জন্যে অন্য কোনও হোটেলে থাকার ব্যবস্থা করা হোক, যা বাড়তি দক্ষিণা পড়বে তাঁরা দিতে প্রস্তুত। কিন্তু এ কথা ওদের স্মরণে নেই যে সঙ্গে ভিসা নেই। ভিসা ছাড়া, আটকা পড়া যাত্রীদের জন্য কেবলমাত্র ঐ হোটেলটিই নির্দিষ্ট।

শেরপার ভারি ফুর্তি। হাত মুখ নেড়ে কি যে সে বলে চলে ফরাসী মাদমোয়াজেলের সঙ্গে আর হিপি ছোকরার সঙ্গে তা সেই-ই জানে! হিপি ছোকরা ফরাসী ছাড়া অন্য কোনও ভাষা তিলমাত্রও বোঝেনা। ভাগ্যিস পকেটে তখনও কিছু ফ্রাঁক আর মার্ক ছিল, দু ফ্রাঁকের বদলে তিন বোতল মিনেরাল ওয়াটার মিলল, পাশের দুই সিঙ্গাপুরীকে দুটি বোতল এগিয়ে দিয়ে তৃতীয় বোতলটি গলাধঃকরণ করে আহারান্তে উঠে পড়লাম। সিঙ্গাপুরীরা পরে তা শোধ দিয়েছিল।

ওয়াইন দিয়ে রিসেপশন কাউন্টারে যেতেই সুখবর। পরের দিন রাত্রি সাড়ে এগারটায় দিল্লী যাবার প্লেনে কলকাতার যাত্রীদের তুলে দেবার ব্যবস্থা হয়েছে। দিল্লী—দিল্লীই সই, ভারতভূমিতে পৌঁছতে পারলেই বেঁচে যাই! নিজ কক্ষে উঠে যাবার সময় লিফট-এ এক

বৃদ্ধা জাপানীর সঙ্গে দেখা, হেসে জিগেস করলেন, "টোকিও ?" বললাম, "নো, ক্যালকাটা !" উনি বললেন, "কম টোকিও !" আমি বললাম, "কম ক্যালকাটা !" আমি নামলাম আটতলায়, উনি নামবেন ন'তলায়। বিছানায় শুয়ে সিলিং-এর দিকে তাকিয়ে আছি, আরও প্রায় ৩৫ ঘণ্টা কাটাতে হয় ! মাঝে মাঝে জানালার ধারে দাঁড়াই, সেই ব্যালেরিনা গাছেরা সার বেঁধে মাথা দোলাচ্ছে, নিচে রাস্তা ধরে কখনও ট্রাক, কখনও মোটর গাড়ি, কখনও বা বাস্ চলছে, এক আধজন পায় হাঁটা ব্যক্তিকেও দেখা যায়। নীল আকাশে সাদা মেঘের মেলায় সামনে দিয়ে ওড়ে চিলের মত ছোট ছোট এরোপ্লেন। সময় যেন আর কাটতে চায় না। একবার বিছানায় শুই, আবার উঠে যাই জানালার সামনে। প্রকাণ্ড বড় জানালা পাল্লা নেই, সবটাই কাচে বাঁধান, বাইরের হাওয়া প্রবেশ করতে পারবে তার কোনও উপায় রাখা হয় নি। প্রকৃতির আলো ঢাকা দিতে হলে পর্দা টেনে দিতে হবে।

দরজায় টক্ ঘা টক্ টক্ ! কে এলোরে বাবা। দরজা খুলে দেখি সেই পাকিস্তানী ভদ্রলোক ! এ সময় তাঁর কি দরকার ? একেবারে আমার ঘরে এসে হাজির ! একটু ঘাবড়েই গিয়েছিলাম। সঙ্গে ছোরা-টোরা নেই তো ? ভদ্রলোক সরাসরি আমার বিছানায় এসে বসলেন। আমার মাথা-আঁচড়ানোর চিরুনীটি তাঁর দরকার, মালপত্র সব তো তাঁর এয়ারপোর্টের গুদামে জমা পড়ে আছে, হাতে যে ব্যাগ নিয়ে তিনি হোটেলে এসেছেন তাতে চিরুনী ছিল না, ফলে ক'দিন ধরে ভদ্রলোক মাথা আঁচড়াতে পারছেন না। স্নানাগারের আর্শির সামনে দাঁড়িয়ে আমার চিরুনী দিয়ে পাকিস্তানী মন ভরে চুল আঁচ-ড়ালেন। দ্বিতীয় কারণ, তিনি সঙ্গী পান না, কার সাথে দুটো কথা বলবেন ? দেশে স্ত্রী কতই না ভাবছেন ! ছেলের বিয়ের দিন আর ক' দিন পরেই, যদি সময় মত উপস্থিত হতে না পারেন কেলেঙ্কারি হবে ! মেয়েগুলো বড় হয়েছে, তাদেরও পাত্রস্থ করে তবে ফিরবেন

আবার জার্মানীতে। পশ্চিম জার্মানীতে ব্যবসা করেন ভালোই, আয় হয়, কিন্তু সংসার ছেড়ে বিদেশে কি আর মন টেঁকে? কথা বলতে বলতে তাঁর স্বর বেশ ভারী হয়ে এল। পশ্চিম জার্মানী থেকে যা মালপত্র নিয়ে যাচ্ছেন দেশে, সেগুলো যে কোথায় গেল কে জানে? সব তো ফ্রাংকফুর্ট এয়ারপোর্ট চেক ইন কাউন্টারে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। "কি কি ছিল বাগাজে?" "দুই দর্জন ঘড়িয়াঁ, ছটা টেপ রেকর্ডার, ছটা ক্যামেরা আর শার্ট, প্যাণ্ট, কাপড় তো আছেই।" লোকটা করেছে কি! এত মাল সঙ্গে নিয়ে করাচী পেঁছিবে? জান পহেচান কাস্‌টম অফিসারের দেখা মিললে ডিউটি এক পয়সাও লাগবে না। লোকটা দিব্যি নিশ্চিন্ত! আমার সঙ্গে মাত্র একটা ক্যামেরা আর একটা মিনি টেপ রেকর্ডার, দুশ্চিন্তার অন্ত নেই! ৩৫ ঘন্টা থেকে কথাবার্তায় প্রায় ঘণ্টা দুয়েক কমে গেল।

সন্ধ্যা হতে ডিনারের সময় পাকিস্তানী এসে বসলেন আমার সামনের চেয়ারে। পরিপাটি করে চুল আঁচড়ানো। বললেন, এ রাত্রিটা কাটাতে পারলেই হয়ে যায়, পরের দিন সন্ধ্যায় করাচীর প্লেন। কনগ্র্যাচুলেশন জানালাম। ডিনারে লাঞ্চের মেনুরই হল পুনরাবৃত্তি! সেই মিনেরাল ওয়াটার সহকারে খাদ্য গলাধঃকরণ। চার পাশে বেশ কয়েকটি আরও নতুন মুখ দেখতে পাচ্ছি! এক বাঙ্গালী আসছেন ঢাকা থেকে, বাঙ্গালী দেখে আমার সঙ্গে সেধে আলাপ করলেন। কিন্তু যে মুহূর্তে শুনলেন সামনের ভদ্রলোক পাকিস্তানী তিনি আর এক সেকেণ্ডও সেখানে নয়। পরের দিন ব্রেকফাস্টে সেই তিন—শেরপা, মাদমোয়াজেল আর হিপি একসঙ্গে; পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেলাম অন্য টেবলে। সিঙ্গাপুরীরা মস্‌কো ত্যাগ করেছে, জাপানীরা রয়েছে, তাদের রেহাই আরও দিন পাঁচেক পর। কোনও অভিযোগ নেই, সদাই হাসি মুখ। লাঞ্চের সময় আবার কিছু নতুন চেহারা! বেশীর ভাগই লণ্ডনের যাত্রী। টেবল পাননি, অপেক্ষা করতে হবে। আমরা খাচ্ছি দলা পাকানো ভাত,

মুসলমানী কাদায় টিকিয়া জাতীয় এক পিস থ্যাতলান মাংসর গোল্লা, শুকনো। কলকাতা থেকে আগত এক যাত্রীর কৌতূহল "এই-ই কি সব?" "হ্যাঁ! পরে অবশ্য কফি পাবেন। রাত্রে, ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে, সুস্বাদু আইসক্রীম পাওয়া যেতে পারে।" সে ভদ্রলোকের ভোগান্তি বেশী হবে না, পরের দিন সকালেই তিনি লণ্ডনগামী প্লেনে চাপবেন।

আবিষ্কার করলাম ঐ রুশী মেয়েরাও প্রেম করে। লাঞ্চ সেরে লাউঞ্জে বসে আছি, নজর চলে গেল দূরের নিভৃত কোণায়। খুব ঘনিষ্ঠ অবস্থায় এক যুবক ও যুবতী। যুবতীটি এরোফ্লোটের ইউনিফরম পরিহিতা। যুবকটি কোনও আটকাপড়া যাত্রী অবশ্যই নয়। বিদেশী প্যাসেঞ্জারদের সঙ্গে প্রেম করলে সে কর্মির চাকরী 'নট' অবশ্যম্ভাবী, তার থেকেও বড় শাস্তি হতে পারে! ওখানে সব পুরুষকেই পুলিশ মনে হয়, প্রেমিক যুবকটি তার ডিউটির এক ফাঁকে একটু সোহাগ করে গেল।

একাই বসে আছি, পাকিস্তানী এক হাতে ব্যাগ অন্য হাতে প্রকাণ্ড বড় এক ট্রানজিস্টার-কাম-টেপ রেকর্ডার-কাম রেকর্ড প্লেয়ার-কাম আরও কিছু, মূল্য আন্দাজ আমাদের দেশের মুদ্রার হাজার পনেরো হবে, আমার পাশে এসে বসলেন। ট্রানজিস্টারটা দেখিয়ে বললেন, এই রকম আরও আছে পাঁচটা আমার বাক্সে। বন্ধুবান্ধব রিস্তেদারদের উপহার দিতে হবে তো! ডাক আসতে হাসি মুখে পাকিস্তানী উঠে পড়লেন, করমর্দন করে আমার কাছে বিদায় জানালেন। পাকিস্তান দেখার আমন্ত্রণ জানাতেও ভোলেন নি।

নোটিশ পেয়েছি, রাত্রি ন'টার সময় প্রস্তুত হতে হবে। সন্ধ্যা সাতটায় সান্ধ্যভোজ গ্রহণ করতে এসে দেখলাম সেই ডেনমার্কের কালা সাহেব অন্য এক শ্বেতাঙ্গিনীর সঙ্গ লাভ করে বড়ই তৃপ্তি সহকারে আধ কাঁচা মাংস চর্বন করেছেন। ও হোটেলের কোনও খাদ্যের প্রতি আমার আসক্তি লোপ পেয়েছে, নিয়ম রক্ষা করতে

পাতে বসলাম। শেরপা, মাদমোয়াজেল আর ঝুঁটি বাঁধা হিপি-কে দেখতে পাচ্ছি দূরের এক টেবলে, তারা যেন এক রাসায়নিক কমপাউণ্ড। শেরপার চলেছে ক্রমাগত হাত নাড়া আর কত কথা। মাদমোয়াজেল স্বপ্ন দেখছেন শাঁপাইনের। আমি বসেছি দুই জাপানীর সঙ্গে। "কেমন খাচ্ছেন?" "নট গুড!" জাপানীদের ঐ খানা খেতে হবে আরও চার-পাঁচদিন। আমার সেই শেষ! এক গুজরাটি নিরামিষাশী মহিলাকে কদিন ধরে স্রেফ আলু সিদ্ধ খেয়ে কাটাতে হয়েছে। তাঁকে আর তাঁর ফুলপ্যান্ট পরিহিতা পাঞ্জাবী সঙ্গিনীকে দেখা যাচ্ছে না। ওঁদের দু জনেরই যাবার কথা আফ্রিকার নায়রোবী। ওঁরা হয়ত এতক্ষণে নায়রোবীর কাছাকাছি পৌঁছে গেছেন।

আরও দু ঘন্টা। কিন্তু দু ঘণ্টাই যেন আর কাটতে চায় না। বিরাট দেহী এক পুরুষ পাশে বসলেন। হোটেল কর্মচারীদের চেনা লোক! যে বয়টি রোজ পানীয় বিক্রি করতে আসে, ভদ্রলোককে দেখে উল্লাসে ফেটে পড়ল। পুরুষটি মস্কো অলিম্পিক্স-এর এক স্বর্ণপদক প্রাপক। হাত এগিয়ে দিলাম করমর্দনের উদ্দেশ্যে; নাম-টাম মনে নেই, কি কসরতে স্বর্ণপদক লাভ করেছেন তাও জিজ্ঞেস করা হয় নি, তবে তাঁর গতর দেখে আমি নিঃসন্দেহ যে তিনি নিশ্চিত স্বর্ণপদকের অধিকারী!

বহু আকাঙ্ক্ষিত মুহূর্তটি এসে পড়তে ঝোলা কাঁধে ঘর থেকে নেমে এসে বসলাম লাউঞ্জে। শুধু চারজনই ভারতগামী যাত্রী নয়, এক এক করে প্রায় জনা পনের জমা হলেন। দুটি আফ্রিকান যুবকও রয়েছে দলে। তারা ভারত সরকারের বৃত্তিভোগী ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্র। ঠিক নটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের তোলা হল গাড়িতে। এয়ার-পোর্টে পৌঁছে পাশপোর্ট ফেরত পেলাম এবং হাতে ধরিয়ে দেওয়া হল দিল্লী থেকে ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইন্স-এ কলকাতা যাবার টিকিট। মেয়ে সিকিউরিটি পুলিশের সে কি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা! হাত-

পা টিপে টিপে দেখে, সারা অঙ্গে কোথাও কিছু মারাত্মক বস্তু নেই নিঃসন্দেহ হয়ে, তবে তিনি ছাড়লেন। ছাড়া পাবার পর, বন্দুকধারী প্রহরীর সন্তর্পণে পাশ কাটিয়ে, বসলাম গিয়ে কাচ ঘেরা অপেক্ষাগারে। প্লেনে ওঠার সংকেত হল আরও প্রায় আধঘণ্টা পর। ভর্তি যাত্রী নিয়ে প্লেনে দৌড় দিল ঠিক পৌনে বারটা নাগাদ। মস্কো থেকে চলেছেন বহুত আদমি। চলেছে একটি রুশী লোকনৃত্য দলও, খুব কম করেও জনা ত্রিশ সভ্য সভ্যা। কয়েকজন মুরুব্বি ছাড়া দলের বাকিরা কিশোর কিশোরী। হাবভাব দেখে অনুমান হয় তারা একেবারেই 'র'—গাঁইয়া। এমন কি এরোপ্লেনের সীটে বসে কেমন করে বেল্ট বাঁধতে হয় তাও দেখিয়ে দিতে হল তাদের। যে দেশের ইউরী গাগারীণ আর ভালেন্তিনা তেরেস্কোভা পাড়ি দিয়েছিলেন মহাকাশে পুরুষদের মধ্যে আর মেয়েদের মধ্যে সর্ব প্রথম, সেই দেশেরই ছেলে মেয়েরা প্লেনের সীটের বেল্ট বাঁধতে শেখেনি—কেউ বিশ্বাস করতে পারবেন? দু একজন ছাড়া আর সবাই বোধ করি ঐ প্রথম এরোপ্লেনে চড়ল। প্লেন আকাশে উড়ে একবার মস্কো শহরের ওপর চক্কর মেরে মুখ ঘোরাল ভারতের দিকে।

তিন সীটের সারির জানালার পাশের সীটটি দখল করেছি। শেষের সীটটিতে বসেছেন এক আলাপী রুশী ভদ্রলোক, মনে হয় দিল্লীর রুশী দূতাবাসের কেউ। মধ্যের সীটটি খালি। এরোফ্লোটে সীট নম্বর দেখে বসবার নিয়ম নেই, যে যেখানে পারবে বসবে। রুশী ভদ্রলোক নৃত্যদলের এক ষোড়শীকে ডেকে আমাদের মধ্যের সীটটিতে বসিয়েছেন; কিন্তু মিনিট তিনেকের মধ্যেই ভদ্রলোকের মুখ গোমড়া করে দিয়ে ওদের দলনেতার পরামর্শে মেয়েটিকে তুলে নিয়ে যাওয়া হল পিছনে, আর আমাদের মধ্যে বসান হল এক অর্বাচীনকে।

প্রহর তিনের মধ্যে জানালার বাইরে সে কি শোভা! যেন মহাশিল্পীর তুলির একেক টানে, ফান গঘের ছবির মত, একেক খণ্ড মেঘের হয়েছে সৃষ্টি। অসংখ্য মেঘ খণ্ড। প্রত্যেক খণ্ডের নিচের

দিকটা সোনালী হাইলাইট। ভূ-পৃষ্ঠে তখনও রাত্রি। অল্প অল্প করে আলো ফুটতে লাগল। বহুরূপী মেঘেরা রঙ পাল্টাচ্ছে, টকটকে লাল শোভা ধারণ করে নিয়েছে। সূর্যদেব কোনদিক থেকে মাথা তুলছেন ঠাহর করতে পারছি না। আমি কবি নই, কবি হলে অন্তত গোটা চার পাঁচ কবিতা লিখে ফেলতে পারতাম। উড়ে চলেছি মাটি থেকে ৪০ হাজার ফুট ওপর দিয়ে। অর্বাচীনের ঘুম ভেঙেছে, দেখছে সে তন্ময় হয়ে প্রকৃতির বর্ণ বিন্যাস বাহাদুরী। উড়ন্ত যানটির গতি ক্রমশঃ মন্থর হয়ে এল, নিচের গাছপালা, যা কালো মেশান সবুজ রঙে লেপামোছা মনে হচ্ছিল ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। দেখতে দেখতে তারা বড় হয়ে উঠল, দু চারটে বাড়ি ঘরও চোখে পড়ছে। এরোপ্লেন নামছে, স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি অর্ধোলঙ্গ ভারতীয় চাষী, মাথায় পাগড়ি, ক্ষেতের কাজে ব্যস্ত। আরো নীচে, আরো নীচে, অবশেষে প্লেনের চাকা গড়াতে লাগল পালাম হাওয়াই বন্দরের দৌড়-পথের ওপর। ভারতীয় সময় তখন সকাল ছ'টা আন্দাজ। প্লেন থেকে বেরিয়ে পড়ার পর রাসায়নিক কমপাউণ্ড গেছে ভেঙ্গে, শেরপা মাদমোয়াজেল-কে ছেড়ে পিছু নিয়েছে আমার। আবিষ্কার করলাম সে একবর্ণও লিখতে বা পড়তে পারে না, একেবারেই নিরক্ষর। কাসটমস তাকে কোনও কারণে ছাড়পত্র দিল না, আমি অল্প সময়ের মধ্যেই খালাস। সকালের কলকাতার ফ্লাইট আমাকে ধরতেই হবে। ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইন্‌স-এর এয়ার বাস্‌-এ বসে যখন বাঙ্গালী হসটেস আর স্টুয়ার্ডের আপ্যায়ন উপভোগ করছি, কি ভাল যে লাগছে তা বলে বোঝানো যাবে না। দমদমে পৌঁছে দেখি সেই মাদমোয়াজেল এগিয়ে চলেছেন, পিছনে আসবাব বহনরত কুলি। শেরপা আর ঝুঁটি বাঁধা হিপিকে দেখা যাচ্ছে না তাঁর সঙ্গে, তাদের কি গতি হল জানি না। মাদমোয়াজেলের বোধকরি, আর কোনই আগ্রহ নেই সঙ্গীদের সম্বন্ধে।

—•—